সবসময়েই
ভাল লাগে
যদি হয়
টসের চা

দেশ-বিদেশে

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রাপ্তিস্থান—
ঈষ্টার্ণ ল হাউস্
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ * * মহালয়া ১৩৪৯

মূল্য চৌদ্দ আনা।

আরতি এজেন্সি, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅনাথনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটস্থ সবিতা প্রেস হইতে শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ

বন্ধুবরেষু—

অনেকদিন থেকেই বহু শিক্ষক এবং অভিভাবক আমাকে ছেলে-মেয়েদের উপযোগী একটি ভ্রমণকাহিনী লেখবার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষের একটি বিবরণ ছেলেমেয়েদের জন্য লিখ্‌ব, এ ইচ্ছা আমারও অনেক দিনের কিন্তু নানা কারণে তা ঘটে ওঠেনি। সম্প্রতি আরতি এজেন্সীর সত্বাধিকারী অনাথ বাবুর আগ্রহাতিশয্যে আমার কয়েকটি ভ্রমণ-কাহিনী একত্রে বার হ'লো। যদি এগুলি বাংলার ভাই-বোনদের ভাল লাগে, আর যুদ্ধ যদি এর ভেতরে থেমে যায়—তা'হলে আর একটি বড়ো ভ্রমণবিবরণ লেখার ইচ্ছা রইল। ইতি-

শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের একটি তোরণ বা গোপুরম্।
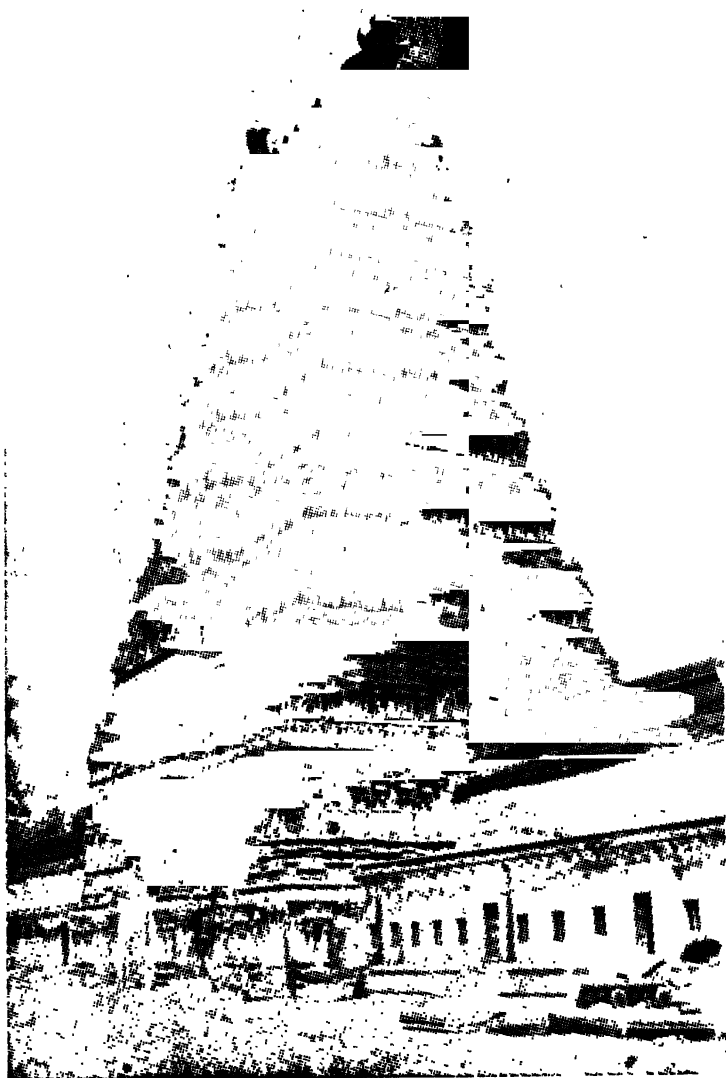
উদয়পুর ও চিতোরগড়

সেবার স্থির করলাম দ্বারকা যাবার পথে উদয়পুর আর চিতোরগড় নিশ্চয় দেখে যাবো।

মেবারের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ? কে-ই বা না শুনেছে এই বীরভূমির নাম! মহারাণা সংগ্রাম সিংহ, রাণা প্রতাপ পদ্মিণীর দেশ এই মেবার—দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ দেশের জন্য প্রাণ-বলিদান এ দেশের মাটির গুণ। শৌর্য্য ও বীর্য্য এর ধূলিকণায় মিশে আছে। এর ইতিহাস সারা পৃথিবীর বিস্ময়।

চিতোরগড় হ'লো সেই মেবারের পুরোনো এবং উদয়পুর নতুন রাজধানী। দিল্লী থেকে বি-বি-সি-আই-এর যে লাইন আজমীর হয়ে চলে গিয়েছে সেই লাইনে আজমীর থেকে যেতে হয় চিতোরগড়, সেখান থেকে আবার উদয়পুর-রেলে চেপে উদয়পুর যাওয়া যায়। আমাদের দ্বারকা যাওয়ার সোজা পথে পড়েনা এটা—আমরা কিন্তু স্থির করলাম যে ওখান থেকে ঘুরে এসে আবার দ্বারকার পথ ধরব তাও ভাল। কিন্তু চিতোর গড় দেখবই। ছেলেবেলা থেকে রাজস্থান পড়ে পড়ে ওখানকার ইতিহাস ছিল মুখস্থ, চোখ বুজলে হাজার বছর আগেকার

ইতিহাস গুলো এমন ভাবে দেখতে পেতাম যেন চোখের সামনে ঘটছে! আর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কবিতা আমাদের পাঠ্য পুস্তকে ছিল,—

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ
ভারতের নানাদেশ করি পর্য্যটন ॥
অবশেষে উপনীত রাজপুতানায়
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায় ॥

মনের মধ্যে কল্পনার ছবি আঁকত। এতদিন পরে সেই রাজপুতানায় যাবার সুযোগ মিলল—

আজমীরে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলুম ভালই। সুদূর প্রবাসে তীর্থযাত্রী বাঙ্গালীর আশ্রয়ের *জন্য* যাঁরা এই বাঙ্গালী ধর্ম্মশালা তৈরী ক'রে দিয়েছেন, তাঁদের চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। বিশেষ ক'রে তখন যে ভদ্রলোক ধর্ম্মশালাটির ভার নিয়ে ছিলেন—অমৃতবাবু—তাঁর মত লোকের আশ্রয়ে গিয়ে পড়া—সে রীতিমত ভাগ্যের কথা!

সুতরাং স্থির হ'ল যে আমরা অধিকাংশ জিনিস আজমীরেই রেখে শুধু দু'দিন চালাবার মত অল্প কিছু জিনিস নিয়ে উদয়পুর থেকে ঘুরে আসব। বাড়ী থেকে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থাও আজমীরেই করা হবে স্থির হ'ল কারণ সেখানে অমৃতবাবু আছেন, তাঁর কেয়ারে টাকা আসাই সুবিধা; দ্বারকার পথে আর কোথাও অমন অভিভাবক পাব কি-না তার ঠিক কি?

উদয়পুর ও চিতোরগড়

আজমীর যাওয়া পুষ্করের জন্য। তীর্থরাজ পুষ্কর—আমাদের শাস্ত্রমতে। আর তার কাছেই সাবিত্রী পাহাড়। সেখানে যাওয়া হিন্দুরমণীদের বহু ভাগ্যের কথা। এই দুটি তীর্থ সেরে সেদিন ক্লান্তদেহে ধর্ম্মশালায় ফিরলুম সন্ধ্যার কিছু আগে। পুণ্যার্জ্জনের ক্লান্তি আমার মা-বৌদিদেরও বেশ জখম ক'রে ফেলেছিল; রান্নার দিকে তাঁরা কেউই এগোলেন না। দুধ, মিষ্টি ও গরম পুরীর ওপর দিয়ে নৈশ-ভোজন শেষ ক'রে আমরা তখনই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলুম। গাড়ী প্রায় এগারোটায়—কিন্তু পাছে আমরা গাড়ী ফেল করি এই আশঙ্কায় অমৃতবাবু রাত ন'টার আগেই কুলী ডেকে আমাদের বিছানা ও অন্যান্য দরকারী যা-কিছু জিনিস ছিল, তাদের মাথায় চাপিয়ে দিলেন। ফলে আমাদেরও তখনই বেরিয়ে পড়তে হ'ল এবং ষ্টেশনে গিয়ে দু-ঘণ্টা ধ'রে ব'সে ব'সে বৃদ্ধদের সময় সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব নিয়ে আলোচনা করা ছাড়া আর কোনও কাজ রইল না।

আজমীর থেকে চিতোরগড় পর্য্যন্ত বোম্বে-বরোদা-সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ব্রাঞ্চ লাইন গেছে কিন্তু সেখান থেকে উদয়পুর যেতে গেলে গাড়ী বদল ক'রে মহারাণার খাস্ লাইনে চড়তে হয়। যাত্রীদের গাড়ী বদল করার সেই 'ভীষণ' কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এক অত্যন্ত সুবিধাজনক ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন এবং সেটা আর কিছুই নয়—থ্রু ক্যারেজ সার্ভিস্

অর্থাৎ একখানা ক'রে গাড়ী ট্রেণের সঙ্গে এমন ভাবে জোড়া থাকে, যাতে ক'রে তাকে চিতোরগড়ে কেটে উদয়পুরের ট্রেণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। অবশ্য প্রত্যেক ট্রেণে সে ব্যবস্থা আছে কি-না ঠিক মনে পড়ছে না, তবে ঐ ট্রেণটাতে থাকেই, সেটা জানি।

আমাদের কুলিপুঙ্গবরা বল্‌লে—বাবু, ভোররাত্রে গাড়ী বদল করার কষ্ট আপনাদের কিচ্ছু পেতে হবে না, আপনাদের একেবারে উদয়পুরের 'ডাব্বায়' তুলে দেব।

ওরা বগি গাড়ীকে বলে ডাব্বা।

যাই হোক্, সেদিন সাবিত্রী দর্শন ও তীর্থরাজ পুষ্করে স্নানরূপ মহাপুণ্যের প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া আমাদের অদৃষ্টে ছিল ; তাই আমরা কুলীদের কথায় রাজী হ'লুম এবং অসংখ্য খালি গাড়ী পার হয়ে গিয়ে সেই বিখ্যাত ডাব্বার একখানি ছোট কামরায় উঠলুম। সে ডাব্বা বা বগি গাড়ীতে একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস, একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ও তু'পাশে তুখানি স্বল্পপরিসর থার্ডক্লাস গাড়ী ছিল। আমরা যে কামরাতে উঠলুম তার তিনখানি বেঞ্চের মধ্যে তু'খানি বেঞ্চে ইতিমধ্যেই এক ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, তাঁর মাসী ও গুটি-তিনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে বিছানাবিছিয়ে জোড়া ক'রে শুয়ে প'ড়েছিলেন। তাঁরা কোথা দিয়ে প্লাটফর্ম্মে আগে ঢুকেছিলেন তা তাঁরাই বল্‌তে পারেন। আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক উঠ্‌লেন, আমরা চারজন আর তিনি—

অতি কষ্টে সেই বাকী ছোট্ট বেঞ্চিটিতে বসলুম এবং ঘুমের আশা একেবারেই রইল না এই ভেবে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়লুম।

কিন্তু এই শোচনীয় নাট্যের এইখানেই যবনিকা পড়ল না। আমরা বসবার মিনিট-তিনেকের মধ্যেই আরও প্রায় জন-আষ্টেক লোক সেই কামরাতে এসে উঠলেন এবং আনাগোনার সঙ্কীর্ণ রাস্তাকে জিনিষপত্র ও নিজেদের উপস্থিতিতে এমনই ভরিয়ে ফেললেন যে তখন আর সে-গাড়ী হ'তে নাম্‌বার চেষ্টা-মাত্র করাও বাতুলতা হয়ে দাঁড়াল। এক কথায় তখন আমাদের অবস্থা দাঁড়াল চক্রব্যূহাবদ্ধ অভিমন্যুর মত। যদি বা প্রবেশ করলুম, নির্গমনের পথ আর রইল না।

এই ভাবেই বসে বসে আর ঢুলতে ঢুলতে চিতোরগড়ে যখন গাড়ী এল, তখন ভোর চারটে হবে, তখনো অন্ধকার আছে পুরোমাত্রায়। প্রথম উষার অস্পষ্ট আলোতে দূরে চিতোরগড়ের একটা আব্‌ছায়া মাত্র নজরে পড়ল, তার মধ্যে কুম্ভের বিজয়স্তম্ভটিই অনেক উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—এইটুকু শুধু বুঝতে পারলুম। ওখানে অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়ালো, একটা ট্রেণ থেকে কেটে আমাদের 'ডাব্বা' আর একটা ট্রেণে জুড়ে দিলে, দেরী হওয়া সেখানে উচিত। আমাদের কিন্তু সে-দিকে খেয়াল ছিল না, আমরা সশ্রদ্ধ ও বিস্মিত দৃষ্টিতে শুধু সেই অতি-বিখ্যাত পাহাড়ের দিকে চেয়েছিলুম।

এই তাহ'লে চিতোরগড়! ছেলেবেলায় যজ্ঞেশ্বরবাবুর অনূদিত টডের রাজস্থান প'ড়েছিলুম। সেই সময়কার কল্পনা-প্রবণ রঙ্গীন মনে তার যে ছাপ প'ড়েছিল, সে ছাপ ইহজীবনে আর মুছবে না। বইখানি বার বার প'ড়েছিলুম, ছেঁড়া বইখানি এখনও আমার বাল্যকালের অত্যাচার বুকে নিয়ে টিকে আছে। কত কথা হয়ত বুঝিনি, কতক-বা বহুবার পড়ার পর মাথায় গিয়েছিল। কিন্তু বাপ্পারাওলের কৈশোর-লীলা থেকে শুরু ক'রে পৃথ্বীরাজ, সঙ্গ, সমরসিংহ, কুম্ভ, প্রতাপ পর্য্যন্ত সকলের অদ্ভুত শৌর্য্য-কাহিনী আমার চোখের সাম্‌নে ছবির মত ফুটে উঠ্‌ত, কখনও মনে হ'ত সে-সব ঘটনা যেন আমার অন্তর্দৃষ্টির সাম্‌নেই ঘটছে। তারপর কাব্য, উপন্যাস, নাটক এবং পাঠ্য-পুস্তকে বার বার সে-সব কথা প'ড়েছি; আসল টডের রাজ-স্থানও একাধিকবার পড়েছি। কিন্তু সে-সব পূর্ব্বের ছবিকেই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেজে ঘষে দেখিয়েছে মাত্র—যজ্ঞেশ্বর বাবুর ছবিই আজ পর্য্যন্ত মনে আঁকা রয়েছে।

মা দ্বিজেন্দ্রলালের অমর সঙ্গীত "মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়" আবৃত্তি করতে লাগলেন, আমরা ভক্তিতদ্‌গত মনে শুন্‌তে শুনতে সেই দিকে চেয়ে রইলুম। সেই অবস্থায় ট্রেণ ছেড়ে দিলে এবং পবিত্র মেবার-ভূমির বুকের ওপর দিয়ে অপরূপ ঝাঁকানি দিতে দিতে ছুটে চল্‌ল। বাংলাদেশের মাঠের ও আলের ওপর দিয়ে গরুর গাড়ী ক'রে যেতে যেতে অনেকবার

ভেবেছি যে হাড়ভাঙ্গা ঝাঁকানিতে গো-যানই সর্ব্বপ্রথম কিন্তু সে ধারণা যে ভুল, তা বুঝতে পারলুম বি বি-সি-আই-আরের ছোট লাইনে চ'ড়ে।

মাওলী জংশনে গিয়ে গাড়ী পৌঁছলো বেলা আটটার সময় এবং এইখানে গিয়ে গাড়ীর প্রায় সমস্ত লোক নেমে গেল। আজমীর থেকে যে-অবস্থায় ছেড়েছিল তার পর বরং ভিড় বেড়েই গিয়েছিল, বিন্দুমাত্র কমেনি ; কিন্তু মাওলীতে পৌঁছে শুধু আমরা চারজন ও সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি গাড়ীতে রইলেম। তিনিও উদয়পুরের যাত্রী, শুনলুম মহারাণার আদেশে তিনি উদয়পুরে যাচ্ছেন। তিনি কোন-এক বিখ্যাত মণিকারের কর্ম্মচারী, গয়নার মাপ ও অর্ডার নেবার জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছে।

মাওলী জংশনে নেমে একটি ব্রাঞ্চ লাইন ধ'রে যেতে হয় নাথদ্বারে। নাথদ্বারে নাথজী নামে এক বিখ্যাত বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। এই নাথদ্বারই রাজপুতানার সবচেয়ে বড় তীর্থ। এমন কি রাজপুতদের মধ্যে অনেকে পুষ্করের স্নানের চেয়েও নাথজীর দর্শন অধিকতর কাম্য ব'লে মনে করেন। আমরা তখন আর নাথদ্বারে গেলুম না, ফেরবার সময় যাবো আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম।

উদয়পুরে গাড়ী গেল দশটার পর। স্টেশনে পৌঁছে কুলীর মাথায় জিনিস চাপিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলুম এবং একটা

টাঙ্গার ওপর জিনিসপত্র চাপিয়ে শহরের দিকে যাত্রা করলুম। আমরা আগেই শুনেছিলুম যে উদয়পুরের টাঙ্গাওয়ালারা পশ্চিমের অন্যান্য শহরের মত দর করে না অর্থাৎ চার আনার ভাড়াকে আড়াই টাকা ব'লে বসে না। প্রথম যখন আমি দিল্লী যাই তখন দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘোরার জন্য আমায় ছত্রিশ টাকা খরচ করতে হ'য়েছিল। চতুর্থবার দিল্লী গিয়ে সেই সব স্থানই মাত্র তিনটাকা খরচে ঘুরে এসেছিলুম। যাই হোক্— উদয়পুর স্টেশন থেকে মহারাণার ধর্ম্মশালায় যাওয়ার জন্য বেচারা চাইলেই মাত্র আট আনা এবং গেল ছ' আনায়। অবশ্য পরে জেনেছিলুম যে চারআনা পাঁচআনাই ওদের খাঁটী প্রাপ্য।

অনেকখানি—প্রায় মাইল-ত্বই চলার পর আমরা উদয়পুর শহরের প্রান্তে পৌঁছলুম এবং সেইখানেই মহারাণার নতুন ধর্ম্মশালা। যখন গাড়োয়ান বল্‌লে এইটিই ধর্ম্মশালা—তখন আমরা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে শুধু চেয়ে রইলুম ; মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সেটা মহারাণার প্রাসাদ বল্‌লেও আমরা বিস্মিত হতুম না। বড় ধর্ম্মশালা আমি অনেক দেখেছি—কিন্তু এমন প্রশস্ত, এত উঁচু এবং এত পরিষ্কার ধর্ম্মশালা আর কোথাও নজরে পড়ে নি। দোতালা বাড়ী, সামনেই আরও উঁচু গম্বুজের ওপর বিরাট এক ঘড়ি। বাড়ীর ভেতরের কাজ তখনও শেষ হয় নি কিন্তু মূল বাড়ীটার কাজ ভেতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ হয়েছে দেখলুম। সন্ত

চূণকাম-করা দেওয়ালের ওপর মধ্যাহ্নের সূর্য্য-কিরণ প'ড়ে এমন এক অপরূপ শুভ্রতার সৃষ্টি ক'রেছিল যে সেদিকে চেয়ে তখনই চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলুম।

ফটক দিয়ে ঢুকেই সামনে একটা দালানের মত ব্যাপার এবং তার ঠিক মধ্যস্থলে মেবার-সূর্য্য প্রতাপসিংহের মূর্ত্তি বিরাজমান। প্রতাপের একপাশে স্বর্গীয় মহারাণা ফতেসিংহের ও অপর পাশে বর্ত্তমান মহারাণা ভূপালসিংহের মর্ম্মর-মূর্ত্তি রয়েছে। সে-দিকে চেয়ে প্রথমেই যে জিনিসটা আমাদের বিস্মিত করলে, সেটা হচ্ছে বর্ত্তমান মহারাণার শ্মশ্রুবিহীন মুখ। প্রতাপ তাঁর ছেলে রাণা অমরসিংহকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে যতদিন না মেবারের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যায় মেবারের মহারাণারা ক্ষৌরকার্য্য করবেন না, তৃণশয্যায় শয়ন করবেন এবং পাতায় ক'রে খাবার খাবেন।

শুনেছি সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত মেবারের মহারাণারা প্রতিজ্ঞাটা বজায় রেখেছিলেন। অবশ্য এখন আর অতটা নেই, এখন তাঁরা সোনার থালার নীচে একটি শুক্‌নো পাতা রেখে খাবার খান, বিছানার নীচে রাখেন এক গাছি খড়। কিন্তু দাড়ী কখনই কামান না। মহারাণা ফতেসিংহ পর্য্যন্ত সকলে আমরণ দু-ধারে ভাগ করা বিরাট দাড়ী বহন ক'রে এসেছিলেন; কিন্তু ইনি সেই কুলপ্রথাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করলেন কি ক'রে? অবশ্য আত্মপ্রবঞ্চনাকে আমরা কুলপ্রথার খাতিরে

বড় ক'রে তুল্‌তে চাই না—কিন্তু বিস্মিত হলুম—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের সমস্ত জাতটাই-ত চিরকাল নিজেকে ঠকিয়ে আস্‌ছে; সুতরাং সেইটেই আমরা আশা করি।

যাই হোক্—মহারাজা ভূপালসিংহের ব্যাপারটা পরে আমরা বুঝতে পেরেছিলুম; তিনি বিকলাঙ্গ এবং বেঁটে, কাজেই তিনি যদি আবক্ষ দাড়ী রাখেন তাহ'লে তাঁকে সত্যিই বিশ্রী দেখাবে। ওখানের অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকে এই কারণটাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করলেন।

যাক্—এইবার আসল কথা। প্রবেশপথের সামনেই ফতেসিংহ-ফ্যাসানের দাড়ীওয়ালা চৌকীদার আমাদের জানালে যে ধর্ম্মশালার মধ্যে তিন রকম আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে। এক রকম হ'ল একেবারে নি-খরচায়, আর এক রকম হলো আট আনায় এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী হ'ল এক টাকায়। আট আনায় আসবাবসুদ্ধ ঘর পাওয়া যাবে—আর ফার্স্ট ক্লাস অর্থাৎ এক টাকার ব্যবস্থায় স্যুট্ বা তিন-চারখানা ঘরের একটা মহল। ওর মধ্যেই শোবার ঘর, ডাইনিং-রুম, ড্রয়িং-রুম প্রভৃতি সব ব্যবস্থা আছে। আমি প্রথমে সেকেণ্ড ক্লাসের ব্যবস্থাই করছিলুম কিন্তু যা-ই শোনা গেল যে সে ঘরের মেঝে ম্যাটিং করা তা-ই মা একেবারে প্রবল আপত্তি জানালেন। ম্যাটিং করা ঘরে কোথায় ব'সে খাওয়া-দাওয়া হবে? সে হ'তেই পারে না।

অগত্যা আমরা সেই বিনা দক্ষিণার ঘরই একটি অধিকার করলুম, কিন্তু পরে দেখলুম যে আমাদের ঐ আট আনা পয়সাই লাভ হ'ল ; কারণ সেই বিনা দক্ষিণার ঘরই এমন চমৎকার যে অকারণ সেকেণ্ড ক্লাস ঘরে একটা খাটিয়ার লোভে যাওয়ায় কোনও দরকার নেই। প্রশস্ত ঘর, জানলা ও দরজা প্রচুর এবং পেটেণ্ট স্টোনের মেঝে। তা-ছাড়া বাথ্‌রুম ও পায়খানা কাছেই। যাত্রীদের জন্য অসংখ্য পায়খানা ও দিনরাত জল পাবার ব্যবস্থা আছে। কল-ঘর ত একাধিক বটেই, তা-ছাড়া আবার বাইরেও কল আছে অনেকগুলি ; আর তা'তে সবসময়েই প্রচুর জল থাকে। পায়খানাগুলিও ভাল—তবে ওদেশের লোকের মাঠে যাওয়াই অভ্যাস, তারা অজ্ঞানতাবশত প্রায়ই সেগুলির অপব্যবহার করে, এই যা অসুবিধা।

তখনও ধর্ম্মশালার রান্নামহল তৈরী শেষ হয়নি। ওদেশের যাত্রীরা উঠানে এবং মাঠে ইট পেতেই সে-কায সেরে নিচ্ছেন —কিন্তু আমাদের তা'তে যেন কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। যাই হোক্—আমাদের তখন এমনই শরীরের অবস্থা যে কোনও রকমে স্নান ক'রে শুয়ে প'ড়তে পারলে বাঁচি। আমি শহরের মধ্যে থেকে টক্ দই, খরমুজ ও পুরী-মিঠাই কিনে আনলুম। সরবৎ, খরমুজ ও সেই খাবার খেয়েই মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করলুম। দুধ ওখানে একেবারেই ভাল পাওয়া যায় না, তার

কারণ গোমাতাদের খাদ্য বিশেষ-কিছু ওখানে জন্মায় না ; তাই দুগ্ধজাত যা কিছু খাবার অর্থাৎ রাবড়ী বা দই একেবারেই তৃতীয় শ্রেণীর। পশ্চিমে ত নয়ই, আমাদের দেশেও গোরুদের ওরকম দুর্দ্দশার কথা আমরা ভাবতে পারি না। বাস্তবিক গরুদের কি অবস্থা ; সেই মরুভূমির মধ্যে তারা টিকে আছে যে এই আশ্চর্য্য !

যজ্ঞেশ্বরবাবু লিখেছিলেন 'স্বর্ণপ্রসূ মিবারভূমি' কিন্তু গিয়ে দেখলুম মেবার শুধু মাত্র রসুনপ্রসূ। হাটে-বাজারে গিয়ে অন্য আনাজের সঙ্গে বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ ঘটে না, কেবল রসুন, প্রচুর রসুন ! এবং বীর মেবারীরা সে প্রাচুর্য্যের যে বিশেষ সদ্ব্যবহার করেন তার পরিচয় পাওয়া যায় কাছে গেলেই। এমন কি টাঙ্গাওয়ালাদের পাশে ব'সে যাওয়া রীতিমত বিপজ্জনক, প্রতি মুহূর্ত্তেই বমি হবার আশঙ্কা থাকে ! রসুন ছাড়া আর একটা সিম ও কড়াইশুঁটির মাঝামাঝি রকমের আনাজ পাওয়া যায়, সেটা খুব সস্তা ; ফলে বাজারে খাবার কিন্‌তে গেলে সেই বস্তুটিরই তরকারী বারবার অদৃষ্টে জোটে।

উদয়পুরের দেওয়ান, সুদূর রাজপুতানার মধ্যস্থলে অতি বিখ্যাত মেবার—তার দেওয়ান—শক্তাবত্‌ও নয়, চন্দাবত্‌ও নয়—নেহাৎই একজন বাঙ্গালী। তাঁর নাম (যতদূর মনে আছে) শ্রীযুত ভূপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একথা শুনে সত্যি-সত্যিই আমরা যথেষ্ট গৌরব অনুভব করলুম। জীবন-যুদ্ধে

বাঙ্গালী আজ হেরে যাচ্ছে, সমস্ত প্রদেশ থেকে সে বিতাড়িত, সে ঘরকুণো এম্‌নি বহু কুৎসা প্রত্যহ শুন্‌তে হয়, তারই মাঝে এইরকম দু'একটা সংবাদ যেন পিপাসার্ত্ত হৃদয়ে অমৃতবর্ষণ করে। পশ্চিমেই যাও আর দক্ষিণেই যাও, শিক্ষাবিভাগে এখনও বাঙ্গালীর যথেষ্ট আধিপত্য আছে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু শাসন বিভাগে তার কর্ত্তৃত্ব ক্রমশই কমে আস্‌ছে। শুন্‌লুম ভূপালবাবু স্বর্গীয় মহারাণার প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁরই স্নেহের বর্ম্ম এখনও তাঁকে বহু লোকের বাঙ্গালী-বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করছে।

আমি যখন গেলুম তখন জয়পুর থেকে তাঁর বাড়ীতে কয়েকজন আত্মীয় এসেছিলেন সুতরাং আমায় একটু বস্‌তে হ'ল। খানিকটা পরেই তিনি বেরিয়ে এলেন এবং আমরা উদয়পুর বেড়াতে এসেছি—সে-বিষয়ে তাঁর সাহায্য চাই—এই কথা শুনেই তিনি পুনরায় ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই আবার যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর হাতে একগোছা অনুমতিপত্র রয়েছে দেখলুম। উদয়পুরের রাজকীয় ব্যাপার যা-কিছু আছে সমস্ত জায়গারই ছাপানো ছাড়পত্র তাঁর কাছে তৈরী থাকে, শুধু সই ক'রে দেওয়ার অপেক্ষা। তিনি তখনই ব'সে সেগুলিতে সই ক'রে দিলেন আর তারই অবসরে মেবারের যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকা ও বর্ণনা আমায় শুনিয়ে দিলেন। তাঁরই মুখে শুন্‌লুম রাজসমন্দর্‌ ও একলিঙ্গের মন্দির সেখান থেকে অনেক দূর, তবে পনেরো-ষোল জন যাত্রীর

ভরসা পেলে বাস ছাড়ে। আর জয়সমন্দর্ অর্থাৎ জয়সমুদ্র প্রায় ষাট মাইল দূরে। আমার মনে বঙ্কিমবাবুর রাজসিংহ পড়ার পর থেকেই রাজসমন্দর্ দেখার একটা বাসনা বরাবর লুকিয়েছিল—কিন্তু ভূপালবাবুর মুখে শুন্‌লুম যে মানুষের কীর্ত্তি হিসাবে জয়সমন্দর্‌ই দেখবার জিনিস। দেশের দুর্ভিক্ষের সময় দেশবাসীর অন্নসংস্থানের জন্য মহারাণা জয়সিংহ ঐ বিরাট হ্রদ খনন করান। হ্রদটার পাড় দিয়ে বরাবর হাঁটলে প্রায় নব্বই মাইল হাঁটতে হয় এবং শুনলুম যে যদি কখনও ঐ জয়সমন্দরের কোন পাড় ভেঙ্গে পড়া সম্ভব হয়, তাহ'লে তার জলে সমস্ত মেবার ভেসে যাবে।

যথারীতি নমস্কারাদির পর ভূপালবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলুম। বাঙ্গালী উচ্চপদ পেয়েও যে নিজের স্বদেশ-বাসীকে ভুলে যাননি, এতে প্রাণে বড় আনন্দ হ'ল। বেরিয়ে এসে দেখলুম সব জায়গার পাশ ত দিয়েছেনই, এমন কি উদয়সাগরের মাঝে জগনিবাস বা জগমন্দির দেখতে যাবার যে রাজকীয় নৌকার ব্যবস্থা আছে, তার দেয় চারটে পয়সা পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছেন। "শ্রীনাও ডুঙ্গা কে কারখানা"কে আদেশ দিয়েছেন আমাদের বিনা দক্ষিণায় পার করতে। এ-টুকু না হ'লেও হয়ত বিশেষ ক্ষতি ছিল না কিন্তু এতে তাঁর মহৎ মনেরই পরিচয় পেলুম। সব ছাড়পত্রেরই এক গৎ, খালি স্থানগুলির নাম বিভিন্ন। যে 'সহেল্লাবাড়ীর'র বেলায় লেখা

হয়েছে 'হামিল হাজাকো শ্রীসহেল্লিয়া বাড়ী দেখায় দেগা'
জগমন্দিরের বেলায়ও তাই, শুধু শ্রীসহেল্লিয়া বাড়ীর জায়গায় শ্রীজগমন্দির বা জগনিবাস এইটুকু তফাৎ! 'হামিল হাজা' শব্দের অর্থ বোধ হয় পত্রবাহক।

ওখান থেকে বেরিয়ে আর শেয়ারে টাঙ্গা পেলুম না, দু'আনা দিয়ে একটা পুরো টাঙ্গাই নিতে হ'ল। টাঙ্গাতে ক'রে চল্‌তে চল্‌তে প্রায় ধর্ম্মশালার কাছাকাছি এসেই এক হাস্যকর ব্যাপার ঘটল এবং অভাবনীয়ভাবে আমার রাজদর্শন হ'ল। কেমন ক'রে তাই বলছি।

টাঙ্গাওয়ালা মনের উৎসাহে গাড়ী হাঁকাচ্ছে এবং আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে কলকাতা কতবড় শহর সেই সম্বন্ধে মনে মনে ধারণা করবার চেষ্টা করছে, এমন সময় সহসা তার বিষম ভাবান্তর ঘটল। আমাদের ধর্ম্মশালার ঠিক পিছনে এসে সে অকস্মাৎ টাঙ্গাসুদ্ধ হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়ল রাস্তা ছেড়ে পাশে খানার মধ্যে এবং আমার বিস্মিত প্রশ্নের কোনরকম জবাব না দিয়ে অস্ফুটস্বরে শুধু "উতারিয়ে বাবু, উতারিয়ে" ব'লে নিজেই নেমে প'ড়ে মাথার পাগড়ী খুলে হেঁট হ'য়ে দাঁড়াল। চেয়ে দেখি মোড়ের কনষ্টেবলও আমার টাঙ্গাওয়ালার মত কোমর পর্য্যন্ত হেলিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, টাঙ্গাওয়ালার পা-দুটো, বোধ করি ভয়েই, ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

তখন রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি দূরে নগরতোরণের মধ্যে থেকে সার-সার তিন-চারখানা মোটর বেরিয়ে আসছে; ব্যাপারটা বুঝতেই পারলুম—স্বয়ং মহারাণা আসছেন সান্ধ্যভ্রমণে। পরে শুনেছিলুম যে তিনি প্রায়ই সর্দ্দারদের সঙ্গে ক'রে ফতেসাগরের ধারে বেড়াতে যান।

যাই হোক্—আমি কিন্তু গাড়ীতেই ব'সে রইলুম। 'শির'-ত আমার 'নাঙ্গা'ই আছে, আর অভিবাদন? কি দরকার খামোকা আমার অভিবাদন করায়? তাঁর সঙ্গে ত পরিচয় ঘটবার কোনও সম্ভাবনা নেই!

মহারাণার গাড়ী আস্তেই আস্‌ছিল; কিন্তু আমার টাঙ্গার কাছাকাছি এসে একেবারে দাঁড়িয়ে গেল। মহারাণা একবার আমার দিকে চাইলেন তারপর ফিরে ধর্ম্মশালার ঘণ্টাঘরটিকে ভাল ক'রে দেখে সে সম্বন্ধে কি-সব আলোচনা শুরু করলেন। মহারাণার খাস-মোটরেও জন-দুই সর্দ্দার ও অন্যান্য পরিজন কেউ কেউ ছিলেন—তাঁরা আমার দিকে ভ্রূকুটীসহ বার বার তাকাতে লাগলেন; কারণ আমি তখনও টাঙ্গাতেই ব'সে এবং তাঁদের অভিবাদন জানাবার চেষ্টামাত্রও করলুম না। একবার ইচ্ছা হয়েছিল নেমে গিয়ে সম্মান জানাবার—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করায় অপমানিত হবার ভয় আছে; তার চেয়ে বিদেশী লোক, অপরিচয়ের দোহাই দিয়ে ব'সে থাকাই ভাল।

আমি সর্দ্দারদের ভাল ক'রে দেখে নিলুম, কিন্তু কে কোন্‌টি তা জানার সুবিধা হ'ল না। চন্দাবৎ, শক্তাবৎ, ঝালাপতি কত নামই বার বার রাজস্থানে পড়েছি ; এঁরা তাঁদেরই বংশধর— কিন্তু সে-সব কথা আজ এঁদের কাছেও বোধহয় শুধু কাহিনী। অনুমান করলুম যে চন্দাবৎ ও শক্তাবৎ যদি থাকেন কেউ এঁদের মধ্যে, খাস্‌ মোটরের ঐ দু'জনই হবেন। টাঙ্গাওয়ালা আন্দাজে ঢিল মেরে সেই রকম পরিচয়ই দিলে বটে কিন্তু তার চেনবার কথা নয়।

যাই হোক, মিনিট তিনেক পরেই আবার ওঁদের মোটরগুলি চল্‌তে শুরু করলো এবং আমার টাঙ্গাওয়ালারও পিঠ সোজা হ'তে শুরু হ'লো। সে বেচারা কিন্তু একটিও কথা বলার আগেই মোড়ের পাহারাওয়ালাটি মার্‌ মার্‌ শব্দে তেড়ে এল তার দিকে। তার বক্তব্যের বঙ্গানুবাদ দিলে এই রকম দাঁড়ায় ; 'হতভাগা, তুই বাবুকে পরিচয় দিলিনে কেন যে মহারাণা আসছেন। বাবু বিদেশী লোক, চিন্‌বেন কি ক'রে ?'

আমি তখন তাকে বুঝিয়ে বললুম যে মূর্ত্তি ও ছবি মহারাণার আমি ঢের দেখেছি, তা'তে ক'রে তাঁকে চিনে নিতে দেরি হয়নি।

সে তখন অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—তবে আপনি নেমে গিয়ে রাজদর্শন ক'রে এলেন না কেন ? চাই কি হয়ত মহারাণা আলাপও করতে পারতেন আপনার সঙ্গে !

আমি হেসে বললুম—বাপু, দর্শন ত এখান থেকেই হ'ল, নেমে গেলে কি বেশী কিছু সুবিধে হ'ত ?

সে বিশেষ কোনও জবাব দিলে না বটে কিন্তু বেশ বুঝলুম যে বাঙ্গালীদের নাস্তিকতায় সে দারুণ চটে গেল। মহারাণা ঘড়িঘরের সামনে গাড়ী দাঁড় করালেন কেন জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিলে—মহারাণা অনেকদিন এ পথ দিয়ে ফতেসাগরের তীরে যান নি ; বোধ হয় ঘড়িঘর বসবার পর আর দেখেন নি, সেইজন্যই গাড়ী থামিয়ে ভাল ক'রে দেখে নিলেন।

আবার আমাদের টাঙ্গা ছেড়ে দিলে। এবার দু-মিনিটের পথ, শিগগিরই পৌঁছে গেলুম। টাঙ্গাওয়ালাকে প্রশ্ন ক'রে জানলুম মহারাণার গাড়ী যখন রাস্তায় বেরোবে তখন তার সামনে অন্য গাড়ী থাকার নিয়ম নেই। সেই জন্যই তাকে গাড়ী নিয়ে খানায় নেমে আস্‌তে হয়েছিল। যাক্—ধর্ম্মশালায় ফিরে রাজদর্শনের শুভ খবরটা মা'কে আর বৌদিকে দিলুম ; তাঁরা শুনেই ছুটে ধর্ম্মশালার ছাদে গিয়ে উঠলেন, যদি মহারাণা সেই পথ দিয়ে ফেরেন তা হ'লে ভাল ক'রে দেখবেন, এই ভরসায়! কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্যবশত মহারাণা সে-পথ দিয়ে আর ফিরলেন না। অনেকক্ষণ রাস্তা চেয়ে ব'সে থেকে-থেকে শেষকালে ওপরতলাটা ভাল ক'রে ঘুরে দেখে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে এলুম। আজিমগঞ্জের 'খানিকটা বাঙ্গালী' এক জমিদার মোকদ্দমা উপলক্ষে প্রায় মাসখানেক এসে ঐ ধর্ম্মশালায়

সেকেণ্ড ক্লাসে আছেন। বাঙ্গালা কথা না বল্‌তে পেয়ে তাঁরও অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল; তিনি ওপরতলায় আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের ডেকে খানিকটা আলাপ করলেন।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই আমরা শুয়ে পড়লুম। স্থির হ'লো পরের দিন খুব সকাল ক'রে উঠেই আমরা নগর ভ্রমণে বার হবো। বিভিন্ন জাতের লোকেদের ঝগড়া, গান ও আলাপের কোলাহলের মধ্যে আমরা অনায়াসেই ঘুমিয়ে পড়লুম এবং পরের দিন সকাল সকাল ওঠার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও উঠ্‌তে একটু বেলাই হ'ল।

যাই হ'ক্—পরস্পরকে অতি মাত্রায় তাড়া লাগাতে লাগাতে আমরা স্নানাদি সেরে—কেবলমাত্র একটু সরবৎ পান ক'রে বেরিয়ে পড়লুম নগর ভ্রমণে—টাঙ্গা দোরের কাছেই কয়েকটি ছিল—তাদেরই একজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ বচসা করার পর তু' টাকায় ভাড়া রফা হ'ল। ভাড়া ঠিক করার পর সে আর একটি বালককে সঙ্গে ডেকে নিলে এবং ভরসা (?) দিলে খানিকটা পরে ঐ বালকের হাতেই আমাদের সমর্পণ ক'রে সে স'রে পড়বে।

ধর্ম্মশালার মাঠ পেরিয়ে, নগর-তোরণের মধ্যে দিয়ে আমরা খাস্ উদয়পুরের মধ্যে ঢুক্‌লুম। ফটকের কাছে জন-কয়েক উদয়পুরী ব'সে তামাক খাচ্ছিল ও আলাপ করছিল; তারা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে বৌদির শাড়ী কিম্বা শাড়ী পরার

ধরণ নিরীক্ষণ করতে লাগল এবং আঙ্গুল দিয়ে কী সব দেখাতে লাগল।

প্রথমেই বাঁ-হাতি রাস্তা ধ'রে সোজা গেলুম 'আজায়ব ঘর' বা মিউজিয়মে। জয়পুরের মহারাজার মিউজিয়ম দেখে যে পরিমাণ আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই পরিমাণ হতাশ হলুম রাজপুতশ্রেষ্ঠ মহারাণার মিউজিয়মের এই ব্যর্থ প্রয়াস দেখে। জয়পুরের দ্রষ্টব্য জিনিস—জগতের শিল্প-চাতুর্য্যের এক অভিনব সংগ্রহ, দু'দিন ধ'রে দেখেও শেষ হয়নি। আর সে বাগানই বা কি সুন্দর! কিন্তু এখানকার বাগানও যেমন হত-শ্রী, তার ভেতরের ছোট হলটি (মিউজিয়ম ঘর)ও তেম্নি অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টায় ভরা। গোটা কতক শিলালিপি, দু'-একটা পুতুল (নানা জাতীয় লোকের মৃৎমূর্ত্তি—তা-ও বেশী নয়), দু' একটা অস্ত্র-শস্ত্র,-ব্যস্! মহারানা প্রতাপের দু একটি মাত্র স্মৃতি-চিহ্ন আছে ; সমস্ত জিনিসের মধ্যে সেইগুলিই যা কিছু দ্রষ্টব্য।

ঐ বাগানেরই মধ্যে গোটা কতক কুকুর, একটা জীর্ণ শীর্ণ হাতি এবং দু-চারটে পাখী, এই নিয়ে মহারাণা পশুশালার সখ মিটিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর একবার অম্বরপতির উল্লেখ না ক'রে পারছি না ; তাঁর পশুশালায় যে কুকুরের অদ্ভুত কলেক্শান দেখেছি তা বোধহয় ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। এত রকম যে কুকুর আছে, তা এর আগে লাহামহাশয়ের প্রবন্ধ প'ড়েও জানতুম না!

বাগান ছেড়ে আমরা আমাদের টাঙ্গার একদফা সারথি-বদল ক'রে যাত্রা করলুম প্রাসাদের উদ্দেশে। প্রাসাদের বাইরে আমাদের টাঙ্গা রেখে রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুক্‌লুম। বোধহয় চার পা গেছি কি না সন্দেহ, একজন ফতেসিংহ-প্যাটার্ণের দাড়ী-ওয়ালা সিপাহী হৈ-হৈ ক'রে এসে প'ড়ে আমায় জানালে যে মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে তবে ভেতরে ঢুকতে হবে। একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করলুম—আমরা বাঙ্গালী, আমাদের মাথায় বুদ্ধি আছে ব'লে পাগ্‌ড়ী বেঁধে তাকে অধিক ভারাক্রান্ত করতে চাই না। এসব কথাই তাকে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু সে অটল—বল্‌লে, 'ইহাই নিয়ম।' কি আর করা যাবে, ভাগ্যিস্‌ সিল্কের চাদরটা নিয়ে বেরিয়েছিলুম, কোনও রকমে সেইটেই মাথায় চাপিয়ে বল্‌লুম, চল বাবা—এইবার কোথায় নিয়ে যাবে; এর চেয়ে ভাল-রকম পাগ্‌ড়ী বাঁধা আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না।

ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বাঁ হাতি শিউনিবাসের দেউড়ী; আমাদের যদিচ শিউনিবাসেরও পাশ ছিল কিন্তু সিপাইরা ভ্রূকুটি ক'রে জানালে যে মহারাণার ভগ্নী এসেছেন এবং তিনি শিউনিবাসেই অবস্থান করছেন, অতএব সেখানে যাওয়ার চেষ্টা যেন আমরা না করি। শুনে একটু আশ্চর্য্য হলুম, কারণ রাজা-মহারাজা এমন কি আমাদের দেশের জমিদার-বাড়ীতেও সেকালে আইন ছিল যে কন্যারা বিবাহ

ক'রে এসে সেই যে শ্বশুরবাড়ী ঢুকবেন একেবারে ম'রে বেরিয়ে যাবেন। যদিও-বা তীর্থযাত্রার অনুমতি পাওয়া যায়, পিত্রালয়-যাত্রার কখনও না। মহারাণা এতদিনের সংস্কারকে এ-ভাবে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন—তাতে বিস্মিত না হয়ে পারলুম না।

মহারাণার বহির্ব্বাটির দেউড়ীতে জন দশেক সিপাহী ব'সে খোস-গল্প করছিল, তারা হৈ-হৈ ক'রে এসে প'ড়ে আমাদের পাশ দেখ্‌লে ; তারপর তাদেরই একজন গাইড্ রূপে আমাদের সঙ্গে চলল। আমাদের সকলেরই পায়ে জুতো ছিল, তা নিয়ে প্রত্যেক বারেই বিব্রত হ'তে হ'ল। কারণ গায়ের চাম্‌ড়া যা'দের মহারাণার মত—তাদের জুতো পায়ে দিয়ে কোথাও যাওয়া নিষেধ। অবিশ্যি সাহেবদের কোনও বাধা নেই, তাঁরা স-বুট সর্ব্বত্র যেতে পারেন।···আইনটি বেশ! দিল্লী-আগ্রাতে সব শাহী-গোরস্থানেও দেখেছি এই ব্যবস্থা। সাহেবরা কালো চামড়াকে ঘেন্না করে ব'লে আমাদের ক্ষোভের আর সীমা নেই। কিন্তু কেন? তাদের গায়ের রঙ্ আমাদের চেয়ে অনেকখানিই সাদা, তারা-ত ঘৃণা করতেই পারে, কিন্তু আমাদের অবজ্ঞা কি তাদের চেয়ে কিছু কম? ঐ যে আবু-পাহাড়ের ওপর দিলওয়ারা মন্দির—সাহেব এমন কি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের পর্য্যন্ত সেখানে অবারিত-দ্বার, শুধু দুর্ভাগ্য-ক্রমে যারা শিরোহীপতির স্বদেশবাসী, তাদেরই পাঁচসিকে ক'রে দর্শনী দিতে হয়!···

মহারাণার বহির্ব্বাটিতে উপস্থিত হ'য়ে রীতিমত হতাশ হলুম। এই কি মহারাণা প্রতাপের রাজপ্রাসাদ? মহারাণা উদয়সিংহ উদয়পুরে প্রাসাদ স্থাপন করেন; সুতরাং মহারাণা প্রতাপের এটা জন্মস্থান না হ'লেও তাঁর বাল্যকাল নিশ্চয়ই এখানে কেটেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই উদয়পুর প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুধু বিলাতী বিলাসসম্ভার জ'মে উঠেছে। মহারাণার বহির্ব্বাটি যেন রাধাবাজারের কাচের দোকান! তার কি দেখ্‌ব? কতকগুলো বিলাতী আলোর ঝাড় আর আয়না। নীচে দু' চারখানা কৌচ-কেদারা ইত্যাদি। কোথাও রুচিবোধ বা সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় নেই, শিল্পকলার প্রতি এতটুকু মর্য্যাদা দেওয়ার চেষ্টা নেই, নেহাৎই কতকগুলো সাধারণ বিলাতী জিনিস, মোটা!···মহারাণা প্রতাপের বংশধর এক মনে শুধু বিলাতী কাচের দোকান উজাড় ক'রেছেন, তাঁদের দেশ-প্রীতির আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রেছেন!

জয়পুর মহারাজের প্রাসাদের মধ্যে আমরা যাইনি, তবে বিখ্যাত সাহিত্যিক অলডাস্ হাক্সলী যে-ভাবে এঁদের সকলের সম্বন্ধে কটাক্ষ ক'রেছেন, তাতে মনে হয় যে সকলেরই সমান অবস্থা। অবশ্য জয়পুরের মিউজিয়াম বা অন্যান্য জিনিস দেখ্‌লে মনে হয় যে অন্তত দেশীয় শিল্পকলার প্রতি টান তাঁর আছে; কিন্তু উদয়পুরের সর্ব্বত্র, কি মহারাণার খাস প্রাসাদ, কি তাঁর জগমন্দির আর জগনিবাস—ঐ একই ব্যাপার! একখানা ভাল

ছবিও কি রাখ্‌তে নেই? ছবির মধ্যে বর্ত্তমান মহারাণা ও স্বর্গীয় ফতেসিংহের রকমারী ছবি সাজানো; একখানা বোধহয় হেমেন্দ্র মজুমদারের ছবি দেখেছিলুম! বিকৃত রুচির এই নিঃসংশয় পরিচয় পেয়ে ভাব্‌তে লাগলুম যে এটা কি স্বদেশ-প্রেমের প্রতিক্রিয়া?

কাজেই প্রাসাদ দেখা আমাদের মিনিট-দশেকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তারপর আমরা প্রাসাদেরই মধ্যের সংকীর্ণ পথ দিয়ে অনেকখানি গিয়ে পেশোলার ধারে একেবারে ঘাটে উপস্থিত হলুম! প্রাসাদটি পেশোলার জল থেকেই সোজা উঠেছে, সুতরাং পেশোলার বুকের ওপর থেকে মন্দ দেখায় না। যদিচ প্রাসাদের কোনওখানেই স্থাপত্য-বিদ্যার বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই, নেহাৎই সাবেককালের একটা বাড়ী, একটু বড়—এই যা!

প্রাসাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে কিন্তু দূরেরজগমন্দির ও জগনিবাস বড় সুন্দর দেখায়—যেন দুটি সাদা হাঁস পেশোলার জলে খেলা করছে। একজন সাহেব দেখলুম মাটিতে ব'সে এক মনে জগমন্দিরের ছবি এঁকে নিচ্ছেন, আর চারিদিকে কতকগুলো মাওলাদের ছেলে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে। ভদ্রলোকের অধ্যবসায়ের পরিচয় পেয়েছিলুম ঘণ্টা-দুই বাদে ফিরে এসে, কারণ তখনও তিনি ছবিই আঁকছিলেন।

আমাদের নৌকার পারাণী-পয়সারও ছাড়পত্র দেওয়া ছিল সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত মনে নৌকায় গিয়ে উঠ্‌লুম; বাকী

আবু পর্ব্বতের উপর একটি মন্দির।

গোপাল মন্দির (মীরাবাই)—চিতোরগড়

কতকগুলি মাড়োয়ারী ও মাদ্রাজী যাত্রী ছিল তাদের কাছ থেকে এক আনা ক'রে ভাড়া নিয়ে পার করলে। এ-ক্ষেত্রে একটা কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, উদয়পুরের মুদ্রা আমাদের মুদ্রার চেয়ে কম মূল্যবান, বোধ হয় আমাদের দশ আনাতে ওদের এক টাকা হয়। প্রত্যেক জিনিসের দাম বল্‌বার সময় কোন্ মুদ্রা, তার উল্লেখ করতে হয়; যথা—'ঘিউকা ভাও এক রূপেয়া কাল্‌দারী।' কাল্‌দারীটা হ'ল ব্রিটিশ ভারতের মুদ্রা, উদয়পুরী হোল ওখানকার। টাকা, সিকি, দোয়ানী, আনি—এমন কি পয়সা পর্য্যন্ত উল্লেখ করার সময় 'কাল্‌দারী' কি 'উদয়পুরী' তা ব'লে দিতে হয়।

পয়সার খাঁইটা দেখলুম উদয়পুরে একটু যেন বেশী। রাজার সিপাই থেকে শুরু ক'রে নৌকার মাল্লা পর্য্যন্ত বখ্‌শীশটা বেশ বোঝে; এমন কি খাস্‌মহলের সিপাইরা পর্য্যন্ত বখ্‌শীশ চাইতে ইতস্তত করে না এবং চাইবার সময় যদিচ এক টাকা চায়, পাবার সময় এক আনি পেলেও তাদের আপত্তি নেই। এই চাওয়ার ব্যাপারটা আবার বাঙ্গালী দেখ্‌লেই বেড়ে যায়।

পেশোলার জলটি বেশ। খুব নির্ম্মল, ওপর থেকে যেন কালো ব'লে মনে হয়। দোষের মধ্যে সামান্য একটু গন্ধ আছে এবং সে গন্ধ রিফাইন হয়ে যখন পাইপে যায় তখনও তার আভাষ পাওয়া যায়। তবে আজমীরের পাইপে আসা বৃদ্ধপুষ্করের জলের মত নয়।...

প্রায় মিনিট-দশেক চলবার পরই আমাদের নৌকা জগনিবাসে গিয়ে পৌঁছল। জগনিবাস হ'ল মহারাণাদের গ্রীষ্মাবাস, মহারাণা প্রতাপের প্রপৌত্র মহারাণা জগৎসিংহ এটি তৈরী ক'রেছিলেন। আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বীপের ওপর জগমন্দির নির্ম্মিত হ'য়েছিল। এইখানেই শাহ্‌জাদা খুরম্, যিনি পরে শাহজাহান হ'য়েছিলেন—বিদ্রোহী অবস্থায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁরই জন্য এইখানে একটি মস্‌জিদ্ তৈরী করা হয়েছিল। আমাদের কর্ণধার বালক মাল্লাটি কিছুতেই আমাদের নৌকা জগমন্দিরে নিয়ে গেল না, নানারকম যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ ক'রে দিলে যে ওখানে দেখবার কিছু নেই।

জগনিবাসেও এমন কিছু নেই। মহারাণা ও মহিষীদের ঘরগুলি সেই বিলিতী-আসবাবে সাজানো ; মহিষীদের স্নানের মহলে একটি ছোট পুকুরের মত আছে, তা'তে জল অবিশ্যি পেশোলা থেকেই আসে, কিন্তু তখন মহিষীদের আসার সময় নয় ব'লে সে জল প'চে আছে। খানিকটা ঘুরেই বুঝতে পারলুম যে এ দূর থেকে দেখেই ফিরে যাওয়া চল্‌ত, ভেতরে আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

আবার নৌকা ক'রে প্রাসাদে ফিরে এলুম এবং প্রাসাদের বাইরে এসে আমাদের সেই দ্বিচক্র-যানে চড়লুম। বেলা তখন বেশ বেড়ে উঠেছে, তবে শেষ শীতের বেলা ব'লে তত কষ্ট আমরা পাইনি।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমাদের সহেল্লা বাড়ী ও ফতেসাগরে যাবার কথা। কিন্তু পথেই পড়ে প্রসিদ্ধ রণছোড়জীর মন্দির। এই মন্দিরে আছেন বিষ্ণুমূর্ত্তি, কিন্তু সেজন্য নয়; অতি সুন্দর কারুকার্য্যের জন্যই মন্দিরটি বিখ্যাত। বস্তুত উদয়পুরে এসে পর্য্যন্ত এই প্রথম আমরা একটা দেখবার মত জিনিস পেলুম। উদয়পুরে বিশাল হ্রদগুলি ও রণছোড়জীর মন্দির ছাড়া আর কোথাও কিছু আছে ব'লে মনেও হয় না।

রণছোড়জীর মন্দির থেকে বেরিয়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে কিছু খাইয়ে নিয়ে আবার রথে চড়লুম। এইবার যাত্রাটা একটু মৃদু চালেই হ'ল; কারণ সেদিন দরবার ছিল ব'লে সর্দ্দাররা সব মোটরে ও ঘোড়ার গাড়ীতে দলে-দলে যাচ্ছিলেন। সুতরাং সেই সংকীর্ণ-পথে আমাদের টাঙ্গা যাবার রাস্তা কোথায়?

প্রাসাদ থেকে অনেকটা দূরে ফতেসাগর। স্বর্গীয় মহারাণা ফতেসিংহেরই কীর্ত্তি এটি। জলবিরল মরুভূমির মধ্যে এত বড় হ্রদ দেখ্‌লে সত্যিই আশ্চর্য্য হ'তে হয়। জয়সমুদ্র যেমন মহারাণা জয়সিংহ ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে করিয়েছিলেন, ফতেসাগরও অত না হোক্, একটা ছোটখাট দুর্ভিক্ষের সময় করা হ'য়েছিল। এতে সখও মেটে এবং রিলিফ-ওয়ার্কও চলে। এই সব হ্রদগুলির জন্যই উদয়পুরের সাহেবী নাম হ'চ্ছে City **of Lakes**!

ফতেসাগর খুব বেশী বড় নয়, আমাদের ঢাকুরিয়া লেকের চেয়ে কিছু বড় হবে। চারপাশ বাঁধানো এবং পাড়ে বেড়াবার জন্য পাকা রাস্তা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘাটও আছে। মোটের ওপর এই নির্ম্মলতোয়া হ্রদটির তীরে গেলে বেশ একটু আনন্দ হয়—

শ্রীসহেল্লা-বাড়ী এই ফতেসাগরেরই পাশে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, মহারাণার বাগান-বাড়ী। বিরাট একটা বাগানের মধ্যে বিশ্রাম করার মত, ভোজ দেবার মত একটা বাড়ী ক'রে রাখা হয়েছে—মহারাণার চিত্ত-বিশ্রাম বলা যেতে পারে। বাগানটি সাধারণ লেবেল থেকে একটু নীচে, তার ফলে গাছে জল দেওয়ার কাযটা খুব অনায়াসে মিটে যায় অর্থাৎ ফতেসাগর থেকে পাইপে ক'রে জল আসে।

বাগানটি মন্দ নয়—গোলাপ ও চামেলীরই প্রাচুর্য্য। বৌদি চারিদিকে গোলাপ-ফুল দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলেন; আমি তাঁকে মহারাণার সিপাইদের ভয় দেখিয়েও নিরস্ত করতে পারলুম না; শেষকালে তাঁকে একটি ফুল তুলেই দিলুম। অবিশ্যি তার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না; কারণ রাজপ্রাসাদের যে মালিনীরা মহারাণীদের জন্য ফুল তুল্‌তে এসেছিল তাদের একজনকে একটি উদয়পুরী পয়সা দিতেই সে চারটে গোলাপ ফুল আর একমুঠো চামেলী আমাদের দিয়ে দিলে। তবে তার অন্য কারণ থাকতে পারে—মালিনীটি ফুল

দিতে দিতে তার সঙ্গিনীটিকে বলছিল,—"ছেলেটি ঠিক আমার ছোট ভায়ের মত দেখতে, না ?"···বলা বাহুল্য যে সেটা আমাকেই ইঙ্গিত ক'রে বলা হ'য়েছিল।

সাহেল্লা-বাড়ী থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত-দেহে সোজা আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরে এলুম এবং পুনরায় স্নান ক'রে সামান্য কিছু জলযোগ ক'রেই শুয়ে পড়লুম—একেবারে তিনটে পর্য্যন্ত। শুয়ে পড়লুম কিন্তু ঘুম হ'ল না, কারণ মা একলিঙ্গ ও রাজ-সমন্দরের জন্য অনবরত তাগাদা দিতে লাগলেন।

কিন্তু হায় ! সে বাসনা আমাদের অপূর্ণ রেখেই আস্‌তে হ'ল। অন্য কোনও যাত্রীই অতদূর যেতে রাজী হ'ল না এবং শুধু আমাদের নিয়ে সেখানে যাওয়া ও ফিরে আসার জন্য বাসও'লা চাইলে ত্রিশ টাকা। তখন ট্রেণ ভাড়া ছাড়া মোটে আমাদের হাতে আছে গোটা কুড়ি-পঁচিশ টাকা। তারই ভেতর রাজপুতানার শ্রেষ্ঠতীর্থ নাথ-দ্বার ও চিতোরগড় সেরে আজমীরে ফিরতে হবে !···মা ক্রুদ্ধ হয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন, একটু আগে টাকার ব্যবস্থা করলেই হ'ত, নয়ত আরও দু'দিন আজমীরে অপেক্ষা করলেই হ'ত—ইত্যাদি।

কিন্তু সে-সবই তখন 'গতস্য'—। আমাদের জয়সমন্দর্‌ ও রাজসমন্দর্‌ উভয়েরই আশা একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করতে হ'ল। ফলে মন এতই খারাপ হয়ে গেল যে চারটের সময় মহারাণার শূকর-ভোজন দেখতে যাবার যে বাসনা ছিল

তা ত্যাগ ক'রেই আমরা নাথদ্বার যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। এই শূকর-ভোজটি নাকি একটি দেখবার জিনিস। ঠিক ঐসময় প্রত্যহ মহারাণার অনুচররা প্রাসাদের প্রাচীর থেকে খাবার নীচে ফেলে দিতে শুরু করে এবং দেখ্‌তে-দেখ্‌তে জঙ্গলের ভিতর থেকে হাজার হাজার শূয়ার এসে জড়ো হয়। সেই সময় মহারাণা নিজেও উপস্থিত থাকেন এবং আরও অনেকে সেই দৃশ্য দেখতে যায়।

ট্রেণ আমাদের প্রায় ছ'টায়। আমরা পাঁচটা-নাগাদ বিছানাপত্র বেঁধে, যথারীতি বখশীশাদির ব্যবস্থা ক'রে ধর্ম্মশালা ও উদয়পুর ত্যাগ করলুম। একে আহার্য্য বিশেষ কিছু পাওয়াই যায় না—তার ওপর রন্ধনাদির এত অসুবিধা, যে বৃথা আর একটা দিনও ওখানে কাটাতে আমাদের কারুর ইচ্ছা হ'ল না।

ট্রেণ অল্প কিছুক্ষণ লেট ক'রে উদয়পুর ছাড়ল এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মাওলী জংশনে গিয়ে পৌঁছল। এইখানে বদল ক'রে আমাদের গাড়ী নাথদ্বারে পৌঁছোল। এই নাথদ্বারই রাজপুতদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভগবান শ্রীনাথজীকে দর্শন করার জন্য ওদের যে আকুলতা এবং তাঁর ওপর যা ওদের বিশ্বাস—তা দেখবার জিনিস।

মাওলী থেকে নাথদ্বার স্টেশন অল্পই দূর। কিন্তু নাথদ্বার স্টেশন থেকে নাথদ্বার শহর আরও সাত মাইল দূরে। এই পথ যাবার জন্য টাঙ্গা এবং একখানা বাসও পাওয়া যায়, যদি

খারাপ হ'য়ে গারাজে প'ড়ে না থাকে! নাথদ্বার স্টেশনটি অন্ধকার এবং কুলী বিরল। অতি কষ্টে আমরা ট্রেণ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে নামলুম এবং শুনলুম যে আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে বাসও আছে। অচেনা জায়গায় এই অন্ধকার রাত্রিতে টাঙ্গা নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় সুতরাং আমরা সকলে বাসে গিয়েই উঠলুম। যদিচ বাস রাত্রিবেলা মাথাপিছু ভাড়া অনেক বেশী নেয় তবু্ও পূর্ব্বোক্ত কারণে সে বাস দেখতে দেখতে বালিসে তুলো ঠাসার মত বোঝাই হয়ে উঠ্‌ল। শেষকালে যখন তারা বুঝলে যে আর কোনও রকমেই তা'তে লোক ভরা সম্ভব নয়, তখন তারা বাস ছাড়লে এবং ধূলোয় স্নান করাতে করাতে ঘণ্টাখানেক বাদে ধর্ম্মশালার সাম্‌নে আমাদের নামিয়ে দিল।

নামিয়ে যখন দিলে তখন ন'টা বাজে নি—কিন্তু তারই মধ্যে সেখানকার দোকানপাট বন্ধ হয়ে এসেছে এবং ধর্ম্মশালার দোরও বন্ধ হয়-হয়। একটা জানলা-দরজা-হীন ঘরে জিনিস-পত্র রেখে ধর্ম্মশালার মুন্সী বা চৌকীদারকেই পয়সা কবুল ক'রে জল আনিয়ে মুখ হাত ধোওয়া হ'ল; তারপর বেরিয়ে পড়লুম খাদ্যদ্রব্যের খোঁজে। একটি মাত্র দুধের দোকান তখনও খদ্দেরের মায়া কাটাতে পারে নি, আর সবই বন্ধ হয়ে গেছে তখন। দুধওয়ালার কাছ থেকে কিছু দুধ আর ক্ষীরের কালাকন্দ্‌ সংগ্রহ করলুম কিন্তু দাম দিতে গিয়ে তার দাবী শুনে

অবাক হয়ে গেলুম। দুধ চার পয়সা সের, রাব্‌ড়ী দু' আনা এবং পেঁড়া ও বর্‌ফি তিন আনা সের।

পরের দিন অন্ধকার থাকতেই শয্যাত্যাগ ক'রে স্নানের জন্য তৈরী হওয়া গেল। কারণ শ্রীনাথজীর দর্শন শুনলুম বড়ই দুর্ল্লভ। ভোরবেলা মঙ্গল-আরতির সময় একবার দর্শন হয়, তার পরেই একেবারে বেলা এগারটা। অথচ আমাদের তখন আর ট্রেণ নেই, তার মানে আরও একদিন অবস্থান; কিন্তু তা'তে তখন আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। —যাই হোক্ কোনও রকমে স্নানাদি সেরে আমরা সূর্য্য-অনুদয়েই মন্দিরে পৌঁছলুম। কিন্তু তখনই কি অসম্ভব ভীড়! শিবরাত্রির দিন কাশীর মন্দিরে যেমন মারামারি হয় তেম্‌নিই পেষাপিষি চলেছে, কি আকুলতা ওদের! সে আগ্রহ চোখে দেখে তবে বোঝা যায় যে ভক্তি কাকে বলে।

"জয় শ্রীনাথজী! নাথোজী কি জয়! হে প্রভু, হে দয়াল, কৃপা রেখো হে স্বামী, হে নাথোজী!"

সকলেরই মুখে চোখে বাক্যে এই আকুতি তখন ভাষা নিয়েছে, হে প্রভু, হে স্বামী, কৃপা রেখো!

কালো পাথরের মূর্ত্তি, অধিকাংশই তখন কাপড়ে ঢাকা, শুধু অনুভবে বোঝা যায় যে বিষ্ণুমূর্ত্তি। কোনও রকমে সেই ভিড়ের মধ্যে একবার চকিতে দর্শন শেষ ক'রে বেরিয়ে এলুম; মা-কে নিয়ে বেরিয়ে আসাই দায়!

ফুল নিজে হাতে ক'রে দেবার হুকুম নেই, গদীতে দিয়ে জমা দিতে হয়, পূজারীরা নিজেদের ইচ্ছামত তার ব্যবহার করবে। আমরাও প্রত্যেকে এক-একটি ডালা কিনে যথাস্থানে জমা দিলুম। তারপর ভগবানের উদ্দেশে আর একবার প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এলুম।

পুরীর জগন্নাথ দেবের মত নাথোজীর প্রসাদও নানা রকমের ও সস্তা এবং পুরীর মতই তা বিক্রী করার জন্য অসংখ্য দোকানযুক্ত বাজার আছে। এখানকার প্রসাদের সুলভতা ও উৎকৃষ্টতার খ্যাতি শুনছি বহুদিন থেকে। সুতরাং অবিলম্বে কিছু প্রসাদ কিনে নেওয়া গেল। খেয়ে দেখলুম সস্তা তা নিশ্চয়ই, কিন্তু উৎকৃষ্ট কিছুতেই নয় বরং নাথোজীর মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রে এই কথা বলা যায় যে তার অধিকাংশই অখাদ্য।

নাথোজীর মন্দির থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ধর্ম্মশালাতে ফিরেই বিছানা-মাদুর বেঁধে নিয়ে আমরা স্টেশনের দিকে রওনা হলুম। ট্রেণ হ'লো সকাল সাড়ে আটটায়, আমাদের বেরোতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। যাবার সময় বাসে কিছুতেই যাবো না এই প্রতিজ্ঞা ছিল; সুতরাং টাঙ্গা ক'রে এক ঘণ্টায় সাত মাইল পথ যেতে পারব কি-না, অত্যন্ত ভয় হ'লো; কিন্তু দেখলুম যে পক্ষীরাজ আমাদের যথাসময়েই নাথদোয়ারা স্টেশনে পৌঁছে দিলে। ভাড়াও হিসেব মত আমাদের কম পড়ল, কারণ টাঙ্গা ঐ-পথের জন্য মাত্র চৌদ্দ

আনা পয়সা নিলে। নাথদোয়ারায় একটা জিনিস খুব সস্তা দেখলুম সে-কথা এখানে উল্লেখ না ক'রে যবনিকা টান্‌ব না—সেটা হ'চ্ছে পেঁপে। চার পয়সায় যে পেঁপে সেখানে কিন্‌লুম তা খুব কম হ'লেও কলকাতায় পাঁচ-আনা বা ছ' আনার কমে দিত না।

এইবার চিতোরগড়!

চিতোরগড় স্টেশনে যখন এসে পৌঁছলুম তখন বেলা একটা বেজেছে। স্টেশনে পৌঁছে কুলিপুঙ্গবকে প্রশ্ন করলুম, বাপু হে, ধর্ম্মশালা আছে?

সে মহা উৎসাহে বল্‌লে, এই যে স্টেশনের কাছেই আছে বাবু, চলিয়ে না—

আশ্বস্ত হয়ে ওর পিছু-পিছু চললুম। কিন্তু স্টেশনের রাস্তাটা পেরিয়েই যে দৃশ্য নজরে পড়ল তা'তে বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। শরৎবাবু গৃহদাহে "শেরশাহের আমলের যে ধর্ম্মশালার" বর্ণনা দিয়েছেন সে ধর্ম্মশালাও এর কাছে লাগে না। ফটকহীন ভাঙ্গা পাঁচীল-ঘেরা প্রকাণ্ড একটা মাঠের মধ্যে সেই কঙ্কালসার ধর্ম্মশালা দাঁড়িয়ে আছে। খুব যে প্রাচীন তা নয়, তবে দেখ্‌লে মনে হয় যে ইটের গাঁথুনীর পর আর নির্ম্মাতাদের সামর্থ্যে কুলোয় নি। ভেতরে বা বাইরে কোথাও বালির কাজের চেষ্টামাত্র করা হয় নি। খান চার-পাঁচ

ঘর, একটা জরাজীর্ণ কুয়া, অত্যন্ত নোংরা ও প্রাচীন পাইখানা একটা এবং খানিকটা কি রাঁধবার জায়গা—এইই সব! হয়ত ধর্ম্মশালার কেউ রক্ষক আছে, কিন্তু তার চিহ্নমাত্র কোথাও দেখ্‌তে পেলুম না। যাত্রীরা যে ঘর খালি পায় তাইতেই মালপত্র নিয়ে ঢুকে পড়ে, খালি না পেলে ফিরে যায়, অন্য ব্যবস্থা দেখে।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তখনই একখানা ঘর খালি হ'লো; আমরা সঙ্গে-সঙ্গে মালপত্র ভেতরে পুরে ফেললুম। ঠিক দুই-তিন মিনিট পরে আর একদল যাত্রী এলেন, তাঁদের অদৃষ্টে আর স্থান মিল্‌ল না; তাঁরা দালানেই মালপত্র নিয়ে মাথাগুঁজে রইলেন। ভদ্রলোকরা গুজরাটী বণিক্—কি কাযে এসেছেন, কিন্তু সপরিবারেই এসেছেন। তাঁরা পরে রাঁধবার জায়গা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে রান্নাবান্না ক'রেছিলেন—এমন কি আমাকে নিমন্ত্রণও ক'রেছিলেন খাবার জন্য; কিন্তু সেই নোংরামীর মধ্যে আমার খেতে প্রবৃত্তি হ'লো না। সেদিন আহারাদির ব্যবস্থা একরকম স্থগিত রাখলুম, মেয়েদের পূর্ণিমা ছিল, সুতরাং কিছু খরমুজ, কাঁকড়ী ও জঘন্য দই-এর ওপর দিয়েই আমরা দিনটা কাটিয়ে দিলুম।

যাই-হোক্—ঘরে জিনিসপত্র রেখে মুখে চোখে জল দিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম চিতোরগড়ের উদ্দেশে। খান দুই টাঙ্গা ধর্ম্মশালার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল; উদয়পুরের মতই জরাজীর্ণ

ঘোড়া এবং দড়ীর সাজ। তাদেরই একখানাকে যাওয়া-আসা ভাড়া ঠিক ক'রে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। রস্থনের দুর্গন্ধে টাঙ্গাওয়ালার পাশে বসা ভার, তবুও কোন-রকমে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইলুম।

ধূ-ধূ করছে মাঠ চারিদিকে ; প্রখর সূর্য্য-কিরণে তা যেন নিঃশব্দে পুড়ছে, আর তারই গরম হাওয়া আমাদের মুখে-চোখে এসে লাগ্‌ছে ; যেন দেহের রক্ত শুধু এই উষ্ণতায় শুকিয়ে উঠ্‌ছে! ভিজে গামছা মাথায় দিয়েছিলুম, নিমেষের মধ্যে তা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠ্‌ল। চারিদিকে শুধু আগুন্‌!

মাঠ পেরিয়ে রেলের লাইন পার হয়ে টাঙ্গা চল্‌ল পাহাড়ের দিকে—একটু একটু ক'রে চিতোরগড়ের পাহাড় আমাদের নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগল। এই সেই চিতোড়গড়, সেখানকার আশপাশে বাপ্পা, কুম্ভ, হামিরের স্মৃতি আজও মিশে রয়েছে—

পাহাড়ের পাদদেশে এবং গায়ে একটা গ্রাম আছে, বস্তুত এইটেই আসল চিতোর। এখানে জনবসতি খুব বেশী, দোকানপাট যা কিছু সবই এখানে। এরই সংকীর্ণ রাস্তার মধ্য দিয়ে বিস্তর রাজপুতের বিস্মিত দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে আমরা এঁকে বেঁকে একটু-একটু ক'রে পাহাড়ের ওপর উঠলুম। ক্রমে এগিয়ে এল গড়ের তোরণ!

প্রথম তোরণ পার হয়ে দুদিকে 'র‍্যাম্‌পার্টের' মধ্য দিয়ে অনেকটা গেলে আবার একটা তোরণ পড়ে, এইখানে জয়মল্লের

স্মৃতিস্তম্ভ আছে। অহোরাত্র সজাগ থেকে এই বীর একদা চিতোরের তোরণ রক্ষা ক'রেছিলেন; শেষকালে সম্রাট আকবরের গুলিতে এঁকে প্রাণ হারাতে হয়। যেখানে তিনি আহত হয়ে প'ড়েছিলেন সেইখানেই স্মৃতিস্তম্ভ একটি স্থাপন করা হ'য়েছে।

দুদিকের প্রাচীরের দিকে চাইতে চাইতে যখন এগোচ্ছিলুম, তখন বার বার মনে হচ্ছিল যে এর প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডটি যেন আমার বিশেষ পরিচিত। যে-সব লোক-দুর্ল্লভ-কীর্ত্তি এর অনুতে-অনুতে জড়িত হয়ে রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই আমার চোখের সাম্‌নে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে যেন।···এর জন্য দায়ী অবশ্য সেই যজ্ঞেশ্বরবাবুর ইতিহাস—

জয়মল্লর স্মৃতিস্তম্ভ পেরিয়ে আরও অনেকটা দুর্গপ্রাচীরের পাশ দিয়ে ওঠবার পর টাঙ্গাওয়ালা বল্‌লে—এইবার নাম্‌তে হবে। যা কিছু দেখবার পায়ে হেঁটে দেখতে হবে—তার পর আবার আমি নীচে নামিয়ে নিয়ে যাব।

অগত্যা নামলুম। সেইখানেই একজন গাইড্ এসে জুট্‌ল। গাইড্‌টিকে আমাদের টাঙ্গাওয়ালা আমাদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলে, হয়ত ওদের কিছু বন্দোবস্ত আছে।

কিন্তু সে যাই হোক্, আমরা গাইড্ পেয়েছিলুম ভালই; ছেলেমানুষ, বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ হবে, কিন্তু নিরক্ষর নয়। টডের রাজস্থান আর গৌরীশঙ্কর ওঝার ইতিহাস তার

মুখস্থ। টডের ইতিহাস অনেকস্থলেই গোলমেলে, অসম্বদ্ধ, একথা আজকাল বহু ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। টডের এম্‌নি বহু অসঙ্গতি ডাঃ ওঝা প্রমাণ প্রয়োগের সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছেন। টডের উক্তি যেখানে যেখানে ডাঃ ওঝা খণ্ডন ক'রেছেন সবগুলিই আমাদের গাইডের কণ্ঠস্থ দেখলুম, যুক্তিগুলি সুদ্ধ। খুব ভদ্র, বেশী লোভ নেই। সে বেচারা আমাকে তার কার্ড দিয়েছিল কিন্তু সেটা হারিয়ে ফেলেছি ব'লে তার নামটা জানাতে পারলুম না।

টাঙ্গা থেকে নেমেই যে পথ দিয়ে আমরা চল্‌তে শুরু করলুম তা'র প্রথমেই পড়ে মহারাণা কুম্ভের মহল ও অপর কয়েকটি সৌধ। এইখানে খানিকটা ঐতিহাসিক অসঙ্গতি আছে, তবে তা'র করকাঘাতে তোমাদের অযথা ভারাক্রান্ত ক'রতে চাই না।

সেই ভগ্নস্তূপের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। এককালে এই প্রাসাদ সত্যিই দেখবার জিনিস ছিল তা আজও বোঝা যায়; লোকজন, দাস-দাসীতে, কোলাহলে যখন সেই সব মহল দিনরাত মুখরিত হয়ে থাক্‌ত, সূর্য্যবংশধরদের প্রতাপ যখনও ম্লান হয়নি, তাঁদের শৌর্য্য যখন পৃথিবীর ভয় এবং হিন্দুস্থানের গৌরব ছিল—তখনকার দিনের খানিকটা স্মৃতি শুধু খ'সে পড়া মিনারে এবং ভাঙ্গা দেওয়ালে আজও লেগে রয়েছে। মহিষীদের ঘোড়াশাল দেখে মনে হ'লো—হায় আজ

কোথায় সেই আর্য্যনারীরা, যাঁরা তেজস্বী আরবী-ঘোড়াকে সংযত ক'রে সওয়ার হ'তেন; দেশমাতৃকাকে স্বাধীনা রাখার জন্য সেই অশ্বপৃষ্ঠে চ'ড়ে যাঁরা যুদ্ধযাত্রা করতেন?

প্রাসাদের কারুকার্য্য আজও বিলুপ্ত হয় নি, স্থাপত্যের গৌরব নিয়ে আজও তার সৌধের খণ্ডাংশ দাঁড়িয়ে আছে—তা' থেকে কি ছিল তা সবটা না হোক্ খানিকটা আমরা বুঝতে পারি; বুঝতে পেরে শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি, আর কি করব?

এইখানেই টড-উল্লিখিত সেই জহরব্রতের বিখ্যাত সুড়ঙ্গ বর্ত্তমান। টডসাহেবের মতে আলাউদ্দীন যখন চিতোরগড় জয় করেন তখন এই সুড়ঙ্গতেই আগুন জ্বেলে পদ্মিনীর দল তাতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। এই সুড়ঙ্গতে তার পর বহুদিন পর্য্যন্ত নাকি এমন বিষাক্ত গ্যাস জমেছিল, যে ওর ভেতর ঢোকবার চেষ্টা করেছে সেই মরেছে। অবশেষে ঝালোরের শনিগুরু সর্দ্দার মালদেব ওর ভেতর ঢুকে দেখেছিলেন এক বিরাটকায় অজগর সর্প সেই সুড়ঙ্গ পাহারা দিচ্ছে এবং অলৌকিক এক নীল আলো সেখানে এখনও জ্বল্‌ছে। কিন্তু ডাঃ ওঝা তাঁর বই-এ প্রমাণ করেছেন যে জহর-ব্রতটা মোটে ওখানে হয়ই নি— কুম্ভের বিখ্যাত বিজয়স্তম্ভের পাশে যে শ্মশানভূমি আছে, সেইখানে হয়েছিল। সে যাই হোক্, কিন্তু এই সেদিনও, দু-চার জন যাঁরা ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা কেউই ফিরে আসেন নি, সেই জন্য সরকার বাহাদুর ওর মুখ একেবারে বন্ধ

ক'রে দিয়েছেন। তবে কেউ-কেউ অনুমান করেন যে চিতোর-গড় থেকে আবুপর্ব্বত পর্য্যন্ত যে সুড়ঙ্গ মহারাণাদের আমলে বর্ত্তমান ছিল ঐটেই সেই সুড়ঙ্গ।

মহারাণা কুম্ভের মহল পেরিয়ে আমরা বিখ্যাত জৈন-মন্দিরের কাছে এসে পড়লুম। মেবারে এক সময় জৈনদের প্রতিপত্তি খুব বেড়েছিল তার সাক্ষ্য নিয়ে আবু পর্ব্বতের দিলওয়ারা আজও দাঁড়িয়ে আছে। মহারাণার মন্ত্রীবংশও জৈন—তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। মহারাণা প্রতাপের সেই বিখ্যাত মন্ত্রী ভামশা—যিনি এককালে প্রচুর অর্থ দিয়ে প্রভুবংশের মান রক্ষা করেছিলেন তিনিও জৈন ছিলেন। মন্দিরটির কারুকার্য্য সত্যই অপূর্ব্ব! ছোট মন্দির, কিন্তু কারুকার্য্যে দিলওয়ারার কাছাকাছি যায়।

ওখান থেকে বেরিয়ে মহারাণাদের অস্ত্রাগারে পৌঁছোনো গেল। সৈন্য-ব্যারাকের চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে, কিন্তু অস্ত্রাগারটি এখনও আছে। এইবার সেই বিখ্যাত জয়স্তম্ভের কাছে আমরা এসে পড়লুম। মহারাণা কুম্ভের অপূর্ব্ব বীরত্বের এবং তৎকালীন রাজপুত-স্থাপত্যের চিহ্নস্বরূপ এই স্তম্ভটি আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভটি বিরাট এবং নির্ম্মাণ-কৌশল অননুকরণীয়। টড্‌সাহেব এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, এবং উচ্চতার যা বিবরণ দিয়েছেন ডাঃ ওঝা মেপে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তা ভুল। যাক্ গে—ও দু' ফুট উঁচু-নীচু নিয়ে
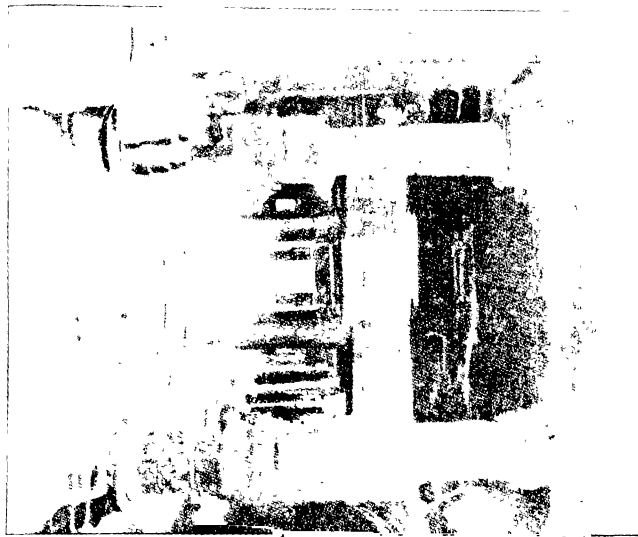
রাজপুতানার দুইটি মন্দির

আমাদের কিছু এসে যায় না, আমাদের বিস্মিত হবার কারণও তাতে চ'লে যায় না। এই জয়স্তম্ভটি বহুদূর থেকে দেখা যায়। এত বড় 'টাওয়ার', কিন্তু নির্ম্মাণকৌশলে দূর থেকে একে একটি সুদৃশ্য থামের মতই দেখায়।

এই জয়স্তম্ভের কাছেই চিতোরগড়ের শ্মশান ছিল এবং ডাঃ ওঝার মতে এইখানেই জ ়রব্রত পালন করা হয়েছিল। ···কোন-কোন ঐতিহাসিক এখন আবার পদ্মিনীর জহরব্রতকে একেবারে কল্পনা ব'লেই উড়িয়ে দিতে চাইছেন—

এইখানে অর্থাৎ জয়স্তম্ভ থেকে একটু দূরে একটি ছোট পার্ব্বত্য ঝরণা আছে। ঝরণার জল সামান্য, টিউবওয়েলের দেড় ইঞ্চি পাইপ থেকে যতটা জল একবারে পড়ে ততটা। এর জল খুব মিষ্টি এবং এখানকার লোকরা বলে খুব হজমীও। ঝরণাটির একটা বিশেষত্ব এই যে এর জল যেখানে পড়ছে— পড়ছে একেবারে একটি শিবলিঙ্গের ওপর। এই শিবলিঙ্গ নাকি মহারাণী পদ্মিনী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তিনি প্রত্যহ এখানে এসে ঝরণার জলে স্নান করতেন আর শিবপূজা করতেন।

যে সিঁড়ি বেয়ে পদ্মিনী নামতেন, সেই সিঁড়ি বেয়েই আমরা নেমে গেলুম এবং ঝরণার জল পান ক'রে মুখ-হাত ধুয়ে গামছা ভিজিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে এলুম। এক রাজপুতানী এসেছিল জল নিতে, সে যাত্রী দেখেই বাবার প্রণামী দাবী

করলে এবং বলা বাহুল্য আমরা পয়সা দেওয়ামাত্র নিজের আঁচলে বাঁধলে।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার উল্লেখ করি। আমাদের সঙ্গেই একদল মাড়োয়ারীও চিতোরগড় দেখতে গিয়েছিলেন! আমাদের সঙ্গেই বলবার অর্থ এই যে তাঁরাও আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ওখানে পোঁছোন। যাই হোক্—গাইড্ একটি তাঁদেরও ধরেছিল এবং যথারীতি ঐতিহাসিক মহিমা সব বোঝাবার চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে তার সঙ্গে ঘুরে শেষকালে ঈষৎ বিরক্তভাবেই তাঁরা বললেন, খামোকা সময় নষ্ট করছ কেন বাপু? কোথায় মন্দির-টন্দির আছে সেইখানে নিয়ে চল। 'কালীমায়ী কি মন্দির।'

ব্যাপারগতিক দেখে তাঁদের গাইড্ তাড়াতাড়ি চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে নিয়ে গেল। আমাদের গাইড্ একটু হেসে বল্‌লে—বাবু, এসব জিনিসের মহিমা কি সবাই বোঝে? সাহেবদের মধ্যে আমেরিকান, আর ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালী—এরাই ঐতিহাসিক জিনিসের মর্য্যাদা বোঝে এবং দেখবার জন্য পয়সা খরচ করে; আর কেউ না। বাঙ্গালীরা আছে, তাই আমাদের অন্ন হ'চ্ছে!

কথাটা শুনে আমার বহুদিনের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। তখন আমি ছেলেমানুষ—একলা আগ্রায় বেড়াতে গেছি। পাথরওয়ালা হোটেলে এসে হাজির হ'লো নানাবিধ

পাথরের জিনিসপত্র নিয়ে। তার মধ্যে একজোড়া পাথরের বড় হাতী আমার পছন্দ হয়েছিল, সেইটেরই দাম জিজ্ঞাসা করলুম ; বললে—আড়াই টাকা। আমি যখন বারো আনা জোড়া দিতে চাইলুম তখন সে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বললে, বাবু, এটা আষাঢ়মাস তাই আড়াই টাকা চাইলুম, পূজো কি বড়দিনের সময় হ'লে দশ টাকা বল্‌তুম।

কৌতূহল হ'লো, বল্‌লুম—কেন বাপু ?

সে বল্‌লে—ঐ সময়ই যে বাঙ্গালীবাবুরা বেড়াতে আসে। বাঙ্গালীবাবু ছাড়া এত দাম দিয়ে এ-সব জিনিস কে কিন্‌বে বাবু ? আমাদের অন্ন ত আপনাদেরই ঘরে !

যাই হোক্‌, শেষ পর্য্যন্ত সে বোধ হয় এক টাকাতে হাতী দুটো দিয়ে গিয়েছিল।

ততক্ষণে আমরা চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে পোঁছেছিলুম, মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। নীচে বলি হয়েছে, তারপর বোধ হয় তারই ছিন্নমুণ্ড নিয়ে কেউ মন্দিরে উঠেছে, সিঁড়ির ধাপে-ধাপে রক্ত পড়তে-পড়তে গেছে এবং সেই রক্ত তখনও কালো হয়ে শুকিয়ে রয়েছে। মনে পড়ল সেই রাক্ষসীর অদ্ভুত শোণিত-তৃষার কথা, ম্যয় ভুখা হুঁ !

শত্রু দ্বারে উপস্থিত, প্রত্যহ শত শত রাজপুতবীরের রক্তে চিতোরগড়ের মাটি লাল হয়ে উঠ্‌ছে, জননীর সন্তান, প্রেয়সীর স্বামী, ভগ্নীর ভাই এবং কন্যার পিতা—কত দুর্দ্ধর্ষ বীর নিত্য

তা'র আত্মীয়াদের বুকে হাহাকার এবং চোখে জলমাত্র সম্বল রেখে নিজেদের শোণিত ঢেলে দিচ্ছে জননী জন্মভূমির জন্য— তবুও 'ভুখা' তুমি এখনও ?

এই প্রশ্নই মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহ ক'রেছিলেন এবং তার জবাব পেয়েছিলেন, রাজরক্ত চাই, ও সব শোণিতে আমার তৃষ্ণা মিটবে না।

রাজরক্ত দেওয়া হ'লো ; রাজা এবং তাঁর একাদশ পুত্র নিজেদের বক্ষ শোণিত ঢেলে দিলেন ; চিতোরেশ্বরীর পিপাসা বোধ হয় তবুও মিটল না ; চিতোর যবনদের করতলগত হ'লো !

কে জানে সেদিন কিসের ক্ষুধা জানিয়েছিলেন চিতোরের জননী, সে ক্ষুধা তাঁর কি ক'রে মিট্‌বে। কিন্তু আজও বোধ হয় সেই তৃষ্ণা মেটাবার জন্যই প্রত্যহ তাঁর সাম্‌নে বলি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু চিতোরের মহারাণার অপরাধ কি রাজরক্তে, কি পশুর রক্তে, কিছুতেই ধুয়ে গেল না ; চিতোরের রক্তপতাকা বার বার বিধর্ম্মী ও বিজাতীয়দের কাছে মাথা নত করলে, আজও ক'রে র'য়েছে !

চিতোরের মহারাণারা বাপ্পারাওলের সময় থেকেই প্রধানত শৈব। তাঁরা মহারাজা নন্—ভগবান্ 'একলিঙ্গ কি দেওয়ান' মাত্র। কি ক'রে যে তাঁরা শাক্ত হয়ে উঠ্‌লেন ভগবান জানেন—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কালীই হ'লেন চিতোরেশ্বরী।

সেই চিতোরেশ্বরীর শোণিত-চিহ্নিত রক্তপ্রস্তরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে বার-বার এই কথাই মনে হ'লো যে কিজন্য আজও চিতোরেশ্বরী ব'লে এঁর পূজো দেওয়া, কেনই বা কতকগুলো অসহায় পশুর রক্ত এঁর জন্য আজও ঢালা হ'চ্ছে? পাঠান এসেছে, মোগল এসেছে, ইংরেজ এসেছে—তাদের হাত থেকেত ইনি চিতোরকে রক্ষা করতে পারেন নি, তবে ইনি কিসের অধিশ্বরী?

চিতোরেশ্বরী দর্শন ক'রে আমরা পদ্মিনী সরোবর ও পদ্মিনীমহাল দেখলুম। পদ্মিনীমহালটি এখনও ভাল অবস্থায় আছে এবং লাট সাহেবরা বেড়াতে এলে এরই বহির্ব্বাটীতে মহারাণা ভোজের আয়োজন ক'রে থাকেন।

চিতোরেশ্বরীর মন্দির ছাড়া গড়ের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির আছে, সেটি হ'চ্ছে ভক্তিমতী মীরাবাই-এর গিরিধারী গোপালের মন্দির। এই গোপালের জন্যই একদিন মীরা তাঁর সব সুখ ছেড়েছিলেন, এই গোপালই তাঁর জনম-মরণের সাথী, এঁরই উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যাকুল কণ্ঠে বার-বার সেই প্রার্থনা বেজেছিল,

> "মীরা দাসী জনম-জনমকী, মম অঙ্গসুঁ অঙ্গ লাগাও,
> প্রভুজী, চিত্তসুঁ চিত্ত লাগাও—"

কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙ্গে তবে মন্দিরে উঠতে হয়। চিতোরগড়ের সব মন্দিরই প্রায় এই রকম। নলহাটীর পীঠস্থান

ললাটেশ্বরীর মন্দির যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি তুলসীমঞ্চ—তার মধ্যে ছোট্ট একটি তুলসীগাছ। এই তুলসীবিরল দেশে তুলসী গাছটি দেখে বড় আনন্দ হ'লো ; কে জানে কেন,—বোধ হয় বাংলা দেশের কথা মনে পড়ল। নাট্যমন্দিরের পাথর বাঁধানো চত্তরটিও বড় ঠাণ্ডা, প্রেমময়ের স্নিগ্ধ অন্তরের আভাস যেন সেই শীতল নাটমন্দিরের বাতাসে লেগে রয়েছে ব'লে মনে হয়। আমরা একটুখানি সেইখানেই স্থির হয়ে বসলুম। তারপর প্রদক্ষিণ ক'রে নেমে এলুম আবার চিতোরগড়ের কঠিন কঙ্করময় পথে—

চিতোরগড় দুর্গের মধ্যেই চাষ-বাস করার যথেষ্ট জমি জায়গা রয়েছে দেখলুম এবং সেখানে চাষ-বাস হচ্ছেও। শত্রুপক্ষ এসে দুর্গ অবরোধ করলে অন্ততঃ কিছুদিনের খাদ্য দুর্গের মধ্যেই জন্মাবে, বোধ হয় এই ছিল স্বর্গীয় মহারাণাদের কল্পনা। এখন ঐখানকার লোকজনই সেই চাষের ফসল উপভোগ করে।

আমরা আরও কিছুক্ষণ ঘুরে এটা-ওটা দেখলুম, তারপর গাইড্‌কে বিদায় দিয়ে আবার টাঙ্গায় চড়লুম।

এবার অবতরণের পালা। আবার সেই টাঙ্গাওয়ালার পাশে ব'সে 'রসুন সৌরভের' ঘ্রাণ নেওয়া এবং চারিদিকের সেই অগ্নিবৃষ্টি! নাম্‌তে নাম্‌তে আমরা বার বার ফিরে চাইতে লাগলুম বাপ্পা-হামির-কুম্ভ-সংগ্রামের চিতোরগড়ের দিকে, মন

যেন অকারণে ভারী হয়ে উঠল, চোখে যেন বাষ্পেরও আভাস দেখা দিলে। কত মহাবীরের বুকের রক্ত ঐ রক্তপ্রস্তরগঠিত দুর্গের মাটিতে মিশে রয়েছে, তা মনে করলেও গা শিউরে ওঠে ; কিন্তু হায়, সব বৃথা! এইখানে এলেই মনে হয়—দৈব বুঝি পুরুষকারের চেয়ে অনেকখানিই বড়, নিয়তি বোধ হয় সত্যই দুর্লঙ্ঘ, নইলে এমন কি ক'রে সম্ভব হয়? চেষ্টার ত্রুটী কিছুই ছিল না, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগেরও ত কোনও অভাব ছিল না, তবে?

ধর্ম্মশালার জঘন্য ঘরে ফিরে এসে আমরা স্নানাহারের যোগাড় দেখলুম। মা ও বৌদি কিছুই খেলেন না প্রায়, আমি ও খোকা পুরী ও দই এনে খাওয়া সারলুম। পুরী আর জিলাপী, এ-ছাড়া বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে আহার্য্য যে এখানে সুলভ তা মানতে হ'লো। আহার করতে-করতেই সন্ধ্যে হয়ে এল, আমাদের ট্রেণ কিন্তু রাত্রি প্রায় দশটায়। বিশ্রাম আমরা ন'টা পর্য্যন্তই করতে পারতুম। কিন্তু বহু যাত্রী স্থানাভাবে তখনও বাইরে ব'সেছিল, তাদের লোলুপ-দৃষ্টি প্রতিনিয়ত যেন আমাদের বিঁধছিল। বেশীক্ষণ তাদের বঞ্চিত না ক'রে ঘণ্টাখানেক পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম স্টেশনের দিকে। সত্যি কথা বল্‌তে কি ধর্ম্মশালার ঘরের চেয়ে খোলা প্লাটফর্ম্মে বিশ্রাম করাই আমার কাছে শ্রেয় ব'লে মনে হ'লো। আর যাত্রীদেরও তাগাদা যে কি ভীষণ ছিল তা এইতেই বোঝা

যাবে যে তাঁরা আমাদের যাত্রার ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র একদল জিনিস-পত্র নিয়ে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লেন, আমাদের বেরিয়ে যাওয়া বা ঘর পরিষ্কার করার বিলম্বও তাঁদের সইল না।

স্টেশনের প্লাটফর্ম্ম তখন অন্ধকার; ট্রেণের সময় ব্যতীত তৈলের অপব্যয় বোধ হয় রেল কোম্পানীর (?) আইনে নেই। আমরা সেই অন্ধকারেই জিনিসপত্র রেখে একটা শতরঞ্জী বিছিয়ে মেয়েদের বসার জায়গা ক'রে দিলুম; আমার ঠিক বসার ইচ্ছা ছিল না, আমি সেই অন্ধকার প্লাটফর্ম্মের উপরেই যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে পায়চারী করতে লাগলুম।

দুই-একটি যাত্রী তখন থেকেই এসে জুটতে লাগল। তারা নিঃশব্দে চলা-ফেরা করছিল, প্রেতাত্মার মতই। আলো নেই, বাতাস নেই, কোলাহল নেই; সমস্তটা জড়িয়ে যেন একটা থমথমে ভাব। অফিসঘরের ক্ষীণ আলো একটা জানালা দিয়ে এসে ওভার-ব্রীজের সিঁড়ির গায়ে প'ড়েছিল, আর ওপরে আকাশে নক্ষত্রের মৃদু আলোক, সেই গভীর তমিস্রার মধ্যে এইটুকুই শুধু ফাঁক ছিল।

আমরা চুপচাপ ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলুম ট্রেণের। আমাদের উত্তরে-দক্ষিণে-পূবে-পশ্চিমে শুধু জমাট অন্ধকার এবং অনেকটা দূরে আরও জমাট খানিকটা অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে চিতোরগড়ের পাহাড়। নিঃশব্দে, মরে যাওয়া অনেক বাসনা বুকে পুঞ্জীভূত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ঐ পাহাড়, ওকে

অন্ধকারেই বোধ হয় মানায় ভালো। আর ঐ কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ? দিবালোকে ও' যেন বিজয়লক্ষ্মীকে উপহাস ক'রতে থাকে; ভালই হয়েছে, এখন ও মুখ লুকোবার মত অন্ধকার পেয়েছে—

মধ্যে-মধ্যে প্ল্যাটফর্ম্মের ডালপালা কাঁপিয়ে একটা ক'রে দম্‌কা গরম হাওয়া ভেসে আস্‌ছিল; দূরের ঐ চিতোরগড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'তে লাগল স্বর্গত মহারাণাদের ক্ষুব্ধ আত্মারা লজ্জায় উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন।

সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্

ভগবান রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করবার জন্য যখন লঙ্কাযাত্রা করেন তখন সমুদ্র তাঁকে বড়ই জব্দ করেছিল। সমুদ্রের ওপর দিয়ে সেতু বেঁধে যাতে নির্ব্বিঘ্নে তিনি যেতে পারেন এই আশায় রামচন্দ্র শিবপূজো করেছিলেন। প্রবাদ যে দক্ষিণ ভারতের সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামক তীর্থটি সেই শিবকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে। এইবার সেখানকার কথাই বলব।

শ্রীরঙ্গম্ থেকে গাড়ীতে চেপেই যে ঘুমিয়েছিলুম, সে ঘুম ভাঙ্গল একেবারে 'পম্বন্' জংশনের কাছাকাছি এসে, গাড়ী যখন সমুদ্র-সেতুর ওপরে উঠেছে। গাড়ীর বাকী যাত্রীরাও অধিকাংশই বাঙ্গালী, তাঁরা দেশ থেকেই শুনে এসেছিলেন যে সাগরের ওপর দিয়ে ট্রেণ যায়—সে এক তাজ্জব ব্যাপার! সুতরাং তাঁদের উৎসাহ ও কোলাহলের অন্ত নেই, সকলেই জানলার দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌ছেন এবং অবিশ্রাম ব'কছেন।

বহুদিন পরে 'বাঙলা কোলাহলে' ঘুম ভেঙ্গে আমিও বাঙ্ক্ থেকে নীচে নেমে এলুম। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, বাইরে তখনও রীতিমত অন্ধকার—সমুদ্রের ঢেউ ঠিক গাড়ীর চাকায় এসে ঠেক্‌ছে (যা আমরা দেশ থেকে শুনে এসেছিলুম) কিম্বা ঢেউ মোটেই নেই (যে সত্য আমরা ফেরবার পথে

আবিষ্কার করেছিলুম)—তা তখন কিচ্ছু বোঝবার উপায় ছিলনা। শুধু আব্‌ছায়া অন্ধকারের মধ্যে বিপুল একাকার জলের অস্তিত্বটা বোঝা যাচ্ছিল মাত্র। যতক্ষণ পোলের উপর দিয়ে চল্‌ল ততক্ষণই প্রায় আমরা বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে রইলুম কিন্তু ফরসা আর হ'ল না ; এমন কি পম্বনে যখন এসে পৌঁছলুম, তখনও রীতিমত অন্ধকার।

সেতুবন্ধ একটি ত্রিকোণাকার দ্বীপের ওপর। দ্বীপটির এক কোণে পম্বন, এক কোণে রামেশ্বরম্ এবং অপর কোণে হ'ল ধনুষ্কোডি। যেহেতু ধনুষ্কোডি বন্দর, সিংহল যাত্রীদের সুবিধার জন্য ট্রেণগুলো সোজা ধনুষ্কোডিতেই যায়, রামেশ্বর যাওয়া-আসা করতে গেলে পম্বনে নামা ছাড়া উপায় নেই। এমন কি রামেশ্বর থেকে ধনুষ্কোডি যেতে গেলেও ঐ ব্যবস্থা।

পম্বনে নেমে রামেশ্বরের গাড়ীতে চেপে বসলুম। অসংখ্য পাণ্ডার ছড়িদার এসে ঘিরে ধরল। পাণ্ডা রামনাথ বিশ্বনাথের হিন্দুস্থানী ছড়িদার (ফরক্কাবাদে তার বাড়ী) শর্ম্মণপ্রসাদ আমাদের মাদ্রাজেই ধরেছিল এবং সেখানে বিস্তর ফায়-ফরমাস খেটে আমাদের প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছিল যে আমরা রামনাথ বিশ্বনাথকেই পাণ্ডা ধরব। আমরাও বিশ্বস্তভাবে তাঁর নাম ক'রে সেই পঙ্গপালের হাত থেকে অব্যাহতি পেলুম। গঙ্গাধর পিতাম্বরের প্রতিপত্তি আর ছড়িদারের সংখ্যাই কিছু বেশী দেখলুম, এমন কি তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমরা অন্য

পাণ্ডা ধরায় রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করলে; তাদের বোধ -করি বিশ্বাস যে, বাঙ্গালী মাত্রেরই ঐ একটি মাত্র পাণ্ডার কাছে যাওয়া উচিত।

শ্রীমান্ শর্ম্মণপ্রসাদ রামেশ্বর স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। লোকটি মধ্য বয়সী, পাকা ছড়িদার। সে যথেষ্ট হাঁকডাক ক'রে একটা 'ঝট্কা' ভাড়া করলে এবং আমাদের মালপত্র তুলে, আমাদের উঠিয়ে দিয়ে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত হেঁটে গেল। আমরা বি-এন-আর অফিসের একজন বুকিং ক্লার্কের কাছ থেকে ভগবান দাসের ধর্ম্মশালার নাম সংগ্রহ ক'রে গিয়েছিলুম, পৌঁছে দেখলুম ভদ্রলোক ভালোই বলেছিলেন। যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি প্রশস্ত; আর একেবারে নতুন। কেবল কুয়োর জলটা খারাপ, মানে নোন্‌তা—খাবার জন্য রাস্তার কল থেকে জল ধ'রে আনতে হয়, এই যা একটু অসুবিধা।

আমরা স্নানাদি শেষ ক'রে তীর্থকৃত্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে পাণ্ডাজীর বাড়ী গেলুম। রামনাথ বিশ্বনাথের বাড়ী মন্দিরের কাছেই। ধর্ম্মশালা থেকেও বেশী দূরে নয়। রামনাথ বিশ্বনাথ মারাঠী ব্রাহ্মণ, মন্দিরের পূজারীদের মধ্যে অন্যতম। মারাঠীরা যখন দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য লাভ করেছিল, তখনই তারা মন্দিরের স্থানীয় পূজারীদের সরিয়ে মারাঠা থেকে পূজারী আনায়। সেই ব্যবস্থা আজও র'য়ে গেছে। পাণ্ডাজীকে

দেখে ভক্তি হ'ল। বেশ সৌম্যমূর্ত্তি, মিষ্টভাষী ও শিক্ষিত। 'Times' ও 'Hindu' তুখানি দৈনিক এবং ইংরাজী 'দীপালী' প্রভৃতি তু'একখানি সাপ্তাহিক পত্র তিনি নিয়মিত নেন্। তিনি সেখানকার তীর্থকৃত্য সম্পর্কে যা যা করবার এবং দেখবার আছে, সমস্তই লিস্ট্ ক'রে দিলেন এবং আমরা কী পর্য্যন্ত অর্থ, সময় ও শক্তি নষ্ট করতে পারি তা জেনে নিয়ে তদনুপাতে লিস্ট্‌টি কিছু সংক্ষেপ ক'রে দিলেন। প্রথমেই লক্ষ্মণকুণ্ডে স্নান ক'রতে যেতে হবে, সেখানে স্নানান্তে ভোজ্য প্রভৃতি উৎসর্গ (ইচ্ছা হ'লে শ্রাদ্ধাদি) তারপর চব্বিশকুণ্ডে সংকল্প ও স্নান (যা আমরা করিনি) এবং দর্শন। পাণ্ডাজী পরে লক্ষ্মণকুণ্ডে যাবেন ব'লে আমাদের তখনকার মত শান্তিলাল ব'লে অপর একটি ছড়িদারের হাতে সমর্পণ করলেন, আমরা গাড়ী ক'রে লক্ষ্মণ-কুণ্ডে যাত্রা করলুম।

বলা বাহুল্য, চেনা শুনা হয়েছে ব'লে আমরা প্রথমে শর্ম্মন-প্রসাদকেই চেয়েছিলুম কিন্তু শান্তিলালকে দেখা মাত্র আমাদের সব আপত্তি চলে গেল। শান্তিলাল গুজরাটি, বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি হবে, প্রিয়দর্শন এবং ভদ্র। মালাবারে তার বাপ মা থাকেন, ওর বাবা সেখানকার কোন্ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ম্যাট্রিকুলেশান পর্য্যন্ত পড়ার পরে সে-ও সেই ব্যাঙ্কে চাক্‌রীতে ঢুকেছিল, কিন্তু বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এখানে পালিয়ে আসে ; অল্প ইংরাজীতে এবং হিন্দীতে কথা বলতে পারে ব'লে আমাদের

পাণ্ডাজী তাকে ছড়িদারের কাজ দিয়েছেন। কিন্তু ছড়িদার-সুলভ কলা-কৌশল তার কিছুই আয়ত্ত হয়নি এখনো, না জানে সে পয়সা আদায়ের নানা রকম ফন্দী, না জানে অতিরিক্ত মাত্রায় যাত্রীদের সেবা করবার অভিনয়।

তাকে যত দেখতে লাগলুম, ততই মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সে কথা কয় আস্তে, মিষ্টি ক'রে, চোখে তার স্বপ্ন, গতিতে তার ছন্দ ; তারুণ্যের যত কিছু সংজ্ঞা, সব যেন তার মধ্যে মূর্ত্তি ধরেছে।

আমরা ঝট্‌কায় চেপে যথাসময়ে লক্ষ্মণকুণ্ডে পৌঁছলুম। এইটিই এখানকার প্রধান তীর্থ—বেশ বড় গোছের একটি চতুষ্কোণ পুকুর, তার ধারে শ্রাদ্ধাদি করার জন্য পাথর বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্তর। দেখলুম বেশ ভীড় হয়েছে, শ্রাদ্ধশান্তি করার মত যাত্রীই বেশী, আমরাই বোধ হয় সবচেয়ে পাষণ্ড—পিতৃ-লোককে যবের আটা কিছুতেই খেতে দিলুম না! আমি স্নানও করলুম না—ধর্ম্মশালা থেকেই সেরে এসেছিলুম—মা স্নান ক'রে সঙ্কল্প করলেন, কথা রইল ধর্ম্মশালায় ফিরে গিয়ে ভোজ্য উৎসর্গ করা হবে।

লক্ষ্মণকুণ্ডের পরই আমরা সোজা মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম। রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড আমাদের পাশে (ছোট ছুটি পুকুর) পড়ে রইলো, আমরা নামলুম না। বেলা তখন বেশ বেড়ে গেছে, রাস্তার বালি তখনই তেতে আগুন হয়ে উঠেছে।

রামেশ্বরম্ মন্দিরের গোপুরম্ বা সিংহদ্বার খুব উঁচু নয়, মাদুরা কিংবা শ্রীরঙ্গম্-এর সঙ্গে তুলনাই চলে না কিন্তু মন্দিরটি আয়তনে প্রকাণ্ড। একবার ঘুরে আসতে হ'লেই মাইল তিনেকের ধাক্কা। সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপটির যে কোনও দিকের কোণে দাঁড়ালে অপর কোণ ভাল ক'রে দেখা যায় না। মন্দিরের মধ্যে বিদ্যুৎ সরববাহ করার জন্য ডায়নামো আছে; কিন্তু রাত্রে অজস্র আলো দেওয়া সত্বেও বিরাট মন্দিরের মধ্যে যেন ভয়াবহ শূন্যতা অনুভব ক'রতে হয়।

মন্দিরটির প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে না ঢুকে আমরা পূর্ব্ব গোপুরম্ দিয়ে ঢুকলুম, কারণ গঙ্গাজলের অফিসটি সেই পথ দিয়েই কাছে হয়। শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢাল্‌তেই হবে. অথচ গঙ্গা বহু দূরে। সুতরাং মন্দিরের কর্ত্তারা পয়সা রোজ-গারের এই অভিনব উপায়টিকে একটুও অবহেলা করেননি। গঙ্গাজল শিবের মাথায় ঢালবার ট্যাক্স হ'ল দু'টাকা, তাছাড়া গঙ্গাজলের দাম আলাদা। একটাকাতে, সিকিভরি আতর ধরে এমনি একটি শিশির এক শিশি গঙ্গাজল পাওয়া গেল। আমা-দেরই সঙ্গে একদল বড়লোক যাত্রী গিয়েছিলেন, তাঁরা ছ'টাকার গঙ্গাজল কিনে ছোট-ঘটির একঘটি জল পেলেন।

জল, ফুলমালা এবং পূজার সামগ্রী নিয়ে আমরা সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ বা দালান পেরিয়ে প্রধান মন্দিরের তোরণে এসে পড়লুম। বিরাট মন্দির, অগণ্‌তি চত্তর এবং তোরণ; এরই মধ্যে নাকি

চব্বিশটি কুণ্ডও আছে কিন্তু সে মাইল-তিনেক হাঁট্‌তে হবে শুনে তখনকার মত সে আশা ত্যাগ করলুম।

রামেশ্বরম্‌ মন্দিরেও, দক্ষিণের আর সব বড় মন্দিরের মত, সোনার ঘণ্টাস্তম্ভ আছে, (যা নাকি বৃন্দাবনে গিয়ে সোনার তালগাছ আখ্যা পেয়েছে) তবে তা কিছু ছোট; সেই দৈন্যটা পুষিয়ে নিয়েছেন দেবাদিদেবের প্রস্তরীভূত ষণ্ডটি। একখানা আস্ত পাথর কেটে এই বিরাট ষাঁড়টি তৈরী করা হয়ত বিশেষ কঠিন নয় কিন্তু কেমন ক'রে এখানে এনে বসানো হ'লো—তাই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

নটরাজের মূর্ত্তির পেছনে যে অপূর্ব্ব কোণ সমন্বিত ছটাটি দেখা যায় (মানে ছবিতে বা নটরাজের মাটির মূর্ত্তিতে দেখা যায়) ঠিক সেইরকম বড় পাথরের ছটা দক্ষিণের সব শিব-মন্দিরের মূল তোরণের কাছে থাক্‌তে দেখেছি; বোধ হয় ওটা শিবেরই প্রতীক্‌ হবে। ঐ পাথরের বিপুল ছটাটিকে অসংখ্য মণিমাণিক্য-খচিত ঝল্‌মলে তোরণের মতই দেখায়।

অবশেষে আমরা মূল মন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়ালাম। জয় রামেশ্বরম্‌—!

হিন্দুর চারটি প্রধান তীর্থ, চার ধামের এক ধাম সেতুবন্ধ-রামেশ্বরম্‌। সীতা উদ্ধারের সময় যখন সাগরের উপর সেতু বাঁধবার দরকার হয়েছিল, তখন নাকি রামচন্দ্র এই শিবলিঙ্গ স্থাপন ক'রে শিবের পূজা করেছিলেন। স্বয়ং রামচন্দ্র-

শ্বাসবহু মন্দির—চিতোরগড়।
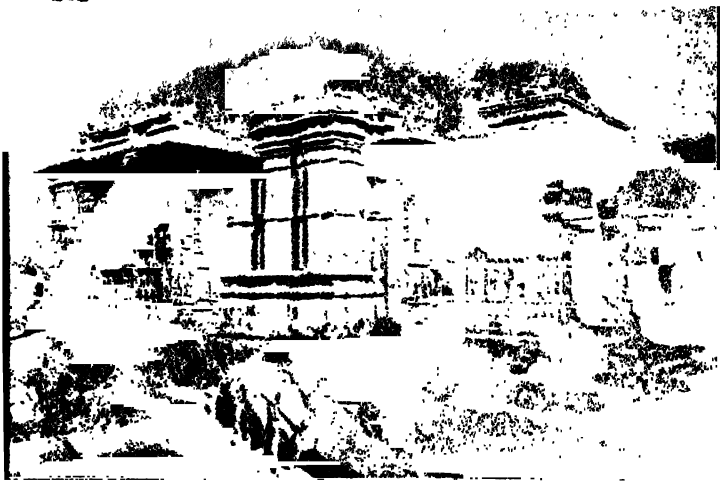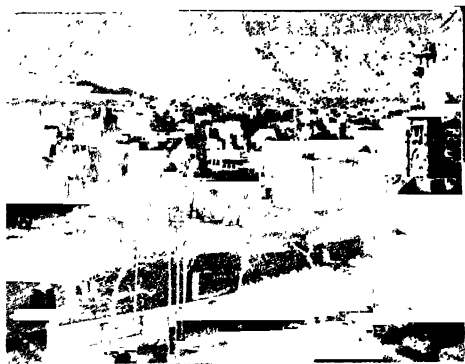
আজমীরের সাধারণ দৃশ্য

সেবিত এই লিঙ্গ বহু জন্মের তপস্যার ফলে পূজা করা যায়,—এই আমাদের বিশ্বাস।

আমরা সকলে বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত এই তীর্থদ্বারে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালুম। বহুদূর বিস্তৃত অন্ধকার পথের শেষে মূল মন্দির, তারই মধ্যে সেই অনাদিলিঙ্গ শিব। পাছে দেখার অসুবিধা হয় ব'লে শিবলিঙ্গের পেছনদিকে অসংখ্য দীপাবলীর ব্যবস্থা। সেই আলোকের পৃষ্ঠপটে দেবঋষি-সেবিত চন্দ্র-শেখরের উজ্জ্বল মূর্ত্তির দিকে আমরা পূর্ণভাবে চেয়ে রইলুম। কত বছর কেটে গেছে, কত লক্ষ যাত্রী প্রতিদিন মরণ পণ ক'রে এই সুদুর্ল্লভ দর্শনের জন্য কত দূর-দূরান্তর থেকে এসেছে, আজও আসছে! সেই বহুজন-আকাঙ্ক্ষিত দর্শন কি সত্যই আমাদের অদৃষ্টে মিল্‌ল? স্তিমিত আলোকের আধো-রহস্যে ঢাকা এই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল এ কি শুধুই পাষাণ মূর্ত্তি? কোটি কোটি যাত্রীর প্রাণের ব্যাকুলতাতেও কি এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি? তা যদি হ'ত তা হ'লে এই দেব-দুর্ল্লভ দর্শনের পরেও কি মানুষকে দুঃখ শোক স্পর্শ কর্‌ত? নিমেষে কি সব অমৃতময় হয়ে যেত না?

হয়ত হয়নি। আমার নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখলুম সেখানে বিশ্বাসও নেই, অবিশ্বাসও নেই; আছে দ্বিধা আছে সঙ্কোচ। হয়ত এমনি দ্বিধা নিয়েই আজ পর্য্যন্ত সমস্ত যাত্রী, ঐ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নর-নারী এখানে এসেছে, তাই

আজও ঐ পাষাণ মূর্ত্তির মধ্যে নীলকণ্ঠ, দিগম্বর, অহিভূষণ, পরম ভিখারী শিবের প্রতিষ্ঠা হয় নি। তাই আমাদের সমস্ত তীর্থযাত্রা বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে ; তাই আজও দিকে দিকে এত হলাহল—এত বিষ সকলের অন্তরে বাহিরে।

শিবের মন্দিরেও সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই, এ শুধু দক্ষিণেই সম্ভব! পূজারীরা আমাদের কাছ থেকে গঙ্গাজল আর পূজার উপকরণ নিয়ে ভেতরে গেল। আমরা শুধু সেই আধো অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণে চেয়ে রইলুম ; পূজারী গঙ্গাজল ঢেলে দিলে, তারপর নারিকেলটা ভেঙ্গে একবার শিব-লিঙ্গের সামনে ধরলে আর কর্পূরটা জ্বেলে আরতির অভিনয় করলে। ব্যস্! পূজা শেষ—দাও পূজারীদের এক টাকা দক্ষিণা আর গঙ্গাজল দেবার সময় নামগোত্র বলার জন্য এক টাকা ট্যাক্স!

বলাবাহুল্য যে, মা বিনা দ্বিধায় তাদের সব দাবীই মেটালেন। সেখান থেকে বেরিয়ে পার্ব্বতী দেবীর দর্শন ক'রে আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরে এলুম। পথে ভোজ্যের থালা, গ্লাস, বাটি, চাল-ডাল-ঘি প্রভৃতি কেনা হ'ল, কাপড় আমাদের সঙ্গেই ছিল, ধর্ম্মশালায় ফিরেও শন্তিলাল খানিকটা ছুটোছুটি ক'রে ভোজ্যের আয়োজন সম্পূর্ণ করলে। পাণ্ডাঠাকুরের হাতে সেই ভোজ্য নিবেদন ক'রে মা প্রায় বেলা একটার সময় তীর্থকৃত্য সমাপ্ত ক'রে জল খেলেন।

সেই দিনই ব্রাহ্মণভোজন করাবার কথা। পাণ্ডাজীকে আমরা টাকা দিয়েছিলাম, তাঁরই বাড়ীতে রন্ধনের আয়োজন হয়েছিল সুতরাং যথাসময়ে শান্তিলাল আমাদের ডেকে নিয়ে গেল, প্রসাদ পাবার জন্য ও দক্ষিণা দেবার জন্য। ভাত, ঘি, পুরী, প্রায় ক্ষুদের মত মোটাদানা সুজীর হালুয়া, ছুটো দাল, একটা ব্যঞ্জন এবং নারকেলের সঙ্গে লঙ্কাবাটা দিয়ে চাটনী, এই হ'ল মেনু। ছড়িদার শর্ম্মণপ্রসাদ এবং জন-সাতেক ব্রাহ্মণ খেলেন, শান্তিলাল খেল না। শুনলাম সে আগে পাণ্ডাজীর বাড়ীতেই খেত, এখন পয়সা চেয়ে নিয়ে হোটেলে খায়। ছেলেটা নিরতিশয় অভিমানী, তার প্রমাণ পদে পদে পাচ্ছি।

আমাদের পাণ্ডানী শুধু রূপসী নন্—সুপাচিকাও। বাস্তবিক এই সুদূর অনার্য্যদের দেশে এমন সরেশ রান্না আশা করিনি। বহুদিন পরে তৃপ্তি ক'রে খেলুম। পাণ্ডানী সুমধুর অথচ শান্ত গম্ভীর হাসিমুখে বার বার আমাদের কি চাই প্রশ্ন করতে লাগলেন, ভাঙ্গা হিন্দীতে আলাপও চলতে লাগল। তাঁর মহিমময়ী চেহারা এখনও আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে।

অপরাহ্ণে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালুম। তারপর সন্ধ্যার মুখে শান্তিলালকে নিয়ে রওনা হলুম সমুদ্রতীরে। যে আশা নিয়ে গিয়েছিলুম তার কিছুই না দেখে কিন্তু অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে পড়লুম। সমুদ্র এখানে একেবারে পুকুরের মত।

আমাদের ঢাকুরিয়ার লেকে যতটা ঢেউ ওঠে, এখানে তাও নেই। বাস্তবিক, পুরীতে সমুদ্র দেখে সমুদ্র সম্বন্ধে যা ধারণা হয়েছিল দ্বারকা, মাদ্রাজ ও রামেশ্বরে এসে তা একেবারে মুছে গেল। বিশেষ ক'রে রামেশ্বরের মত স্থির সমুদ্র আর বোধ করি কোথাও নেই। যাই হোক্—সমুদ্রের ধারে অসংখ্য পাথরের মধ্যে একটাতে গিয়ে বসলুম, তবু জল ত! শান্তিলাল ওরই মধ্যে একটু দূরে একটা বড় পাথরের ওপর গামছা বিছিয়ে শুয়ে প'ড়ে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল। হয়ত ভাব্‌তে লাগ্‌ল তার মা বাপের কথা, অন্য স্বজনদের কথা—যাদের সে ছেড়ে এসেছে।

আর একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের ধর্ম্মশালাতে ছিলেন, সমুদ্রের ধারে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল; থাকেন বৌবাজারে, পঞ্চানন তলাতে; নাম বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্পোরেশন-বিখ্যাত শৈলপতি বাবু তাঁর ভগ্নিপতি হন। তাঁর সঙ্গে শীগ্‌গিরই আলাপ জমে উঠল, স্থির হ'ল যে, পরের দিন প্রত্যুষে আমরা একসঙ্গেই ধনুষ্কোডি যাব। শুধু ধনুষ্কোডি নয়, আমরা তাঁর সঙ্গে তারপর তাঞ্জোর পর্য্যন্ত গেছি এবং বুঝেছি বহুভাগ্যেই তাঁর মত সঙ্গী পাওয়া গিয়েছিল। ভদ্রলোক আদর্শ সঙ্গী।

রাত্রে একে চারটের সময় ওঠবার দুশ্চিন্তা, তায় মশা, ভাল ক'রে ঘুম হ'লনা। যথাসময়ে উঠে, প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে

স্টেশনে রওনা হলুম। খিদিরপুর থেকে আর এক দল বাঙ্গালী যাত্রী এসে স্টেশনের কাছে একটা ধর্ম্মশালায় ছিলেন, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে ধনুষ্কোডি চল্লেন, একেবারে রীতিমত দল। কিন্তু আজ আর শান্তিলাল নেই। বোধ হয় ছড়িদারের বকশিশ্ খোয়াবার ভয়ে শর্ম্মণপ্রসাদই তাকে সরিয়ে নিজে সঙ্গে এসেছে।

ধনুষ্কোডি বন্দর থেকে সিংহলের জাহাজ ছাড়ে; এই হ'ল তার প্রধান পরিচয়। কিন্তু সেটা যে কী ক'রে আমাদের তীর্থ হয়ে দাঁড়াল তা আজও আমি জানি না। পাণ্ডাদের প্রশ্ন ক'রে সদুত্তর পাওয়া যায় না—কেউ বলে যে, এখানে রামচন্দ্র ধনুক পুঁতে ছিলেন, কেউ বলে, ধনুক দান করেছিলেন (যে দুটোরই কোন অর্থ বা কারণ নেই)। মোদ্দা সেখানে নারকেল হাতে দিয়ে সঙ্কল্প করিয়ে স্নান করাবার লোকের অভাব নেই, ভিখারীও প্রচুর এবং ব্রাহ্মণরাও যথাসময়ে ঝুলির ভেতর থেকে সোনার ধনুক বার ক'রে 'মালক্ষ্মী'দের জানায় যে, যেহেতু স্থানটার নাম ধনুষ্কোডি সেহেতু এখানে ব্রাহ্মণদের সোনার ধনুক দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য···। বছর তিনেক আগে পর্য্যন্ত এখানে একটা ঠাকুর কিম্বা মন্দিরের চিহ্নও ছিল না। সম্প্রতি কোন্ এক মাড়োয়ারী একটি ছোট মন্দির ক'রে দিয়েছে, সেখানে জনকতক লোক থাকে, তারা যাত্রীদের ছোলা-সেদ্ধ এবং পানীয় জল দিয়ে দুই একটি পয়সা নিয়ে থাকে।

আমরা যথারীতি ধনুষ্কোডির স্নান সেরে স্টেশনে ফিরে এলুম ; সেখান থেকে ট্রেণটা গিয়ে একেবারে বন্দরের ওপর প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রইল। সিংহলের জাহাজ এসে দাঁড়াতে তার যাত্রী নিয়ে তবে ছাড়ল, ফলে রামেশ্বরম্ এসে পৌঁছলুম প্রায় একটায়। সেদিনও বেলা হবার আশঙ্কা ক'রে পাণ্ডাজীর বাড়ীতেই প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখে গিয়েছিলাম সুতরাং বিশেষ কোনও অসুবিধা হ'লনা।

বিকেলে নিজেরাই একটা ঝট্‌কা ক'রে রামচট্‌কা বা রামঝরোখা দেখতে গেলুম। মাইল দেড়েক বালি পেরোবার পর একটা উঁচু টিলা, তার ওপরে একটি মন্দিরে রামচন্দ্রের পাদুকা না কি একটা আছে। মন্দিরের ছাদের ওপর থেকে সম্পূর্ণ দ্বীপটির দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, বোধ করি মন্দিরের সেইটেই প্রধান উদ্দেশ্য।

সেখান থেকে ফিরে শহরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখতে এবং বাজার করতেই রাত হয়ে গেল। শহর সেটা নয়, নিতান্ত ছোট এবং অকিঞ্চিৎকর জায়গা। মনে কোন দাগ রাখে না, পুনরায় দেখতে ইচ্ছে করে না। দক্ষিণের তীর্থের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ নেই, তার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ নেই। তাই মধ্যে মধ্যে এ ভ্রমণ সম্পূর্ণ অর্থহীন, হয়ত বা বিরক্তিকরও লাগ্‌ছিল। পুণ্য সঞ্চয়ের নেশা যার নেই, তাঁর অন্তত চোখের খোরাক চাই ; রামেশ্বরম্ এমন স্থান যে,

সে শ্রেণীর লোকেদের আকর্ষণ করবার কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। পুরী বা গোপালপুরে তবু সমুদ্রতীরের শোভা আছে, কিন্তু এখানে তাও নেই; পুকুরের মত স্থির জল দেখতে দেখতে বিরক্তি বোধ হয়।

রাত্রে ফিরে এসে জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে রেখে শুলুম। সেই ভোরের ট্রেণ ধরতে হবে, সেখানাই সোজা মাত্বরা যায়। বিশ্ববাবুও আমাদের সঙ্গে যাবেন স্থির হ'ল; ভদ্রলোকের আবার এমন বাতিক, তিনি ভোরবেলা উঠে বিছানা বাঁধবার ভয়ে রাত্রি থেকেই বিছানা বেঁধে রেখে সারারাত মেঝেতে শুয়ে কাটিয়ে দিলেন।

পাণ্ডাজী রাত্রে এলেন সুফল দিতে। সঙ্গে সঙ্গে তুজন ছড়িদারও এলো। আমাদের নাম-ধাম বিররণ সব লিখে নিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে ছেড়ে দিলেন! ভদ্রলোক যথাসম্ভব নির্লোভ। আমরা তাঁকে ছয় টাকা ও মাতাজীকে তু' টাকা প্রণামী দিলুম, তিনি একটি কথাও বললেন না। ছড়িদারদের প্রত্যেককে এক টাকা ক'রে বক্‌শিশ দিলুম, শর্ম্মণপ্রসাদের হাসিমুখের বাহার দেখে বোধ হ'ল যে, এটাও সে আশা করেনি।

রাত্রে শোবার আগে শান্তিলাল আমাদের রামেশ্বরের শয়ন দেখাতে নিয়ে গেল। প্রত্যহ রাত্রে সাজসজ্জা ক'রে উপযুক্ত জাঁকজমক সহকারে রামেশ্বরের কাঞ্চন মূর্ত্তি দেবী-

পার্ব্বতীর মন্দিরে যান শয়ন করবার জন্য; সেখানে সোনার দোলায় দু'জনের সুবর্ণ মূর্ত্তি সাজিয়ে আরতি করা হয়। পুষ্প-মাল্যের প্রাচুর্য্যও খুব বেশী, আরও অনেক বিলাসের আয়োজন ভিখারী ভোলার জন্য সাজানো থাকে।

সে দিনও রাত্রে মশার উৎপাতে এবং দুশ্চিন্তায় ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। চারটের সময় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে তৈরী হবার আগেই শান্তিলাল এসে হাজির হ'ল। ছেলেটির মুখ বিষাদগম্ভীর, বোধ হয় সে আমাদের একটু ভালবেসেছে। তুলে দিতে যাবার তার কথা নয়, কিন্তু তবু সে সকলের আগে এসেছে। সে-ই-ঝট্‌কা ঠিক ক'রে আনলে, আমাদের মালপত্র তুলে সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন পর্য্যন্ত গেল। আরও আশ্চর্য্য হলুম যখন সে আমাদের টিকিট কিনতে গিয়ে নিজের পয়সাতেই পম্বনের টিকিট কিনে আনলে, অর্থাৎ সে আমাদের সঙ্গে পম্বন পর্য্যন্ত যাবে, আবার ভোরের ট্রেণে রামেশ্বর ফিরে আসবে। যতটা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকা সম্ভব, তার একমুহূর্ত্ত আগেও সে ফিরতে চায় না!

আমারও মন ভার হয়ে উঠ্‌ছিল। সমস্ত দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের মধ্যে এই একটি মাত্র প্রিয়-দর্শন গুজরাটী তরুণের সঙ্গই কি তাহ'লে আমার অন্তর স্পর্শ কর'লে? গাড়ীতে উঠে মাকে শুইয়ে, বিশ্ববাবুর শোবার ব্যবস্থা ক'রে আমি একটু দূরে গিয়ে বসলুম। শান্তিলালও আস্তে আস্তে আমারই পাশে গিয়ে বস্‌ল।

ট্রেণ ছাড়্‌ল্, একটা স্টেশন পার হয়ে পম্বনে এসে থাম্‌ল ; আমরা দুজনেই চুপচাপ পাশাপাশি বসে আছি ; শান্তিলালের হাত আমার হাতের মধ্যে ধরা। কোন্ এক নিবিড় সহানুভূতি, যা কোনও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমাদের দুজনের মনের কথা পরস্পরকে নীরবে জানিয়ে দিচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কী যে আকর্ষণ আমাদের দুজনের মধ্যে ছিল, তা আজও জানি না, আজ তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসরও নেই। কিন্তু সেই সময়টির জন্য বিভিন্ন প্রদেশবাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী, অসমান-বয়স্ক দুটি লোকের মন সহসা একই ব্যথায় মিলিত হয়েছিল।

পম্বনে বহুক্ষণ ঐ ট্রেণটা দাঁড়ায়, ডাউন ট্রেণকে পথ দেবার জন্য। সেই সমস্ত সময়টা শান্তিলাল বসে রইল। শেষ পর্য্যন্ত যখন সত্যই ট্রেণ ছাড়ল, তখন অগত্যা সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু তার সেই বিদায় নেবার পূর্ব্বেকার মুখের ছবি আজও আমার মনে আছে। সে মুখের দিকে চেয়ে ভুলে গেলাম সে গুজরাটী আর আমি বাঙ্গালী ; ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে থাকি আমি, সে থাকে সর্ব্ব-পশ্চিম-প্রান্তে ; মনে হ'ল, আমার পরম স্নেহাস্পদ ছোট ভাইকে আমি চিরকালের মত বিদায় দিচ্ছি।

কী নীরব ভাষায় আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ পেল জানিনা, তার মুখও শেষ মুহূর্ত্তে আমার মুখের কাছে এগিয়ে এল,

আমিও পরম স্নেহে তাকে চুম্বন করলাম! সে আমার একখানা হাত তার দুটি হাতের মধ্যে নিয়ে একবার গভীরভাবে চেপে ধরলে, তারপর চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ল! ট্রেণ তখন রীতিমত জোরে চলতে শুরু করেছে!

শান্তিলালকে কখনও ভুলব না।

জয় রামেশ্বরম্—এবার মাদুরা; মীনাক্ষি দেবী।

মীনাক্ষী মন্দির

ভোরবেলা রামেশ্বরম্ ছেড়ে বেলা ৯টা নাগাদ আমরা মাদুরা এসে পৌঁছলুম। বড় স্টেশন এবং ভেতরে শহরের কর্ম্ম-ব্যস্ততা দেখেই বোঝা গেল যে, এইবার সত্যিই একটা শহরে এসে পড়লুম! মাদুরা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দ্বিতীয় নগরী, অর্থাৎ খাস মাদ্রাজ শহরের পরেই এর স্থান। এতদিন দক্ষিণের যে সব তীর্থে ঘুরে বেড়ালুম, তার মধ্যে তীর্থই সব, মন্দির বাদ দিয়ে বাকীটা গ্রাম মাত্র। শ্রীরঙ্গম্-এর শহর ত্রিচিনোপল্লী, শ্রীরঙ্গম থেকে পুরো তিনটি মাইল গেলে তবে পাওয়া যায়।

মাদুরায় নেমে প্রথমেই যে ব্যাপারটা আত্মাকে শান্তি দিলে সেটা হচ্ছে এখানে পাণ্ডার উৎপাতের অভাব। অবিশ্যি, কুলীরা কম বকালে না, কিন্তু তার জন্য দুঃখ ক'রে লাভ নেই, বকা আর বকানো এদের সকলেরই স্বভাব। পাণ্ডা নেই তার কারণ, মীনাক্ষিমন্দির দ্রষ্টব্য হিসাবে খুব বড় হ'লেও তীর্থ-গৌরব এর কম। এর পেছনে কোন দৈব ব্যাপারের কাহিনী জড়িত নেই!

মাদুরা স্টেশনের বাইরেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের 'মাঙ্গাম্মাল ছত্রম্'। সার-সার চারটি বড় বাড়ী, এখানে দৈনিক সামান্য ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের থাকতে দেওয়া হয়। মিউনিসিপ্যালিটির

আর একটি ছত্রম্ আছে বটে কিন্তু সেটা শুনেছি নোংরা। আমরা 'মাঙ্গাম্মাল ছত্রম্'-এ থাকব আগে থাক্‌তেই স্থির ছিল, সুতরাং কুলীদের সেই নির্দ্দেশই দিলাম। কিন্তু অফিসে গিয়ে শোনা গেল কোণের বাড়ীতে একটি মাত্র ঘর আছে, দৈনিক আট আনা ভাড়া। আমরা একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে সেই ঘরটি দখল করলুম ; ঘরটি না পেলে আমাদের দুর্দ্দশার অন্ত থাকত না। পশ্চিমের যে কোনও বড় শহরে বা তীর্থে যেমন অসংখ্য ধর্ম্মশালা ও হোটেল থাকে এখানে সে সব কথা কল্পনা করাও দুরাশা। এখানে যে সব হোটেল আছে, তা ভাতের দোকান মাত্র, সেখানে বাসা পাওয়া যায় না।

ছত্রম্-এর বাসাটি ভালই। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোতলা বাড়ী। ভাগ্যক্রমে আমরা একটি দোতলার ঘরই পেয়েছিলাম ! কিন্তু জলের বড় অভাব ; পুরুষদের জন্য খোলা জায়গায় একটি কল এবং মেয়েদের জন্য একটি ছোট বাথরুম। অতগুলি লোকের এই মাত্র ব্যবস্থা ! সুতরাং স্নান বা কাপড়কাচার জন্য গেলেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়।

বাসায় পৌঁছতেই একটি গাইড পাওয়া গিয়েছিল, সে কোনমতে ভাঙ্গা ইংরিজীতে জানিয়ে দিলে যে, এগারটার সময়ে মীনাক্ষি দেবীর মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে এবং এগারটা বাজতেও আর বিলম্ব নেই। কিন্তু হবে কি ক'রে—? কলঘরে তখন

দুটি মাদ্রাজী, একটি মারহাট্টি এবং কলঘরের বাইরেও জন দুইতিন মাদ্রাজী ও রাজপুত মেয়ে দাঁড়িয়ে—তারপর মা! অগত্যা তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ রাজপুত মেয়েটির সঙ্গে যথাসাধ্য হিন্দীতে আলাপ চালাতে লাগলেন। ছেলেমানুষ বৌ, বয়স বড়জোর আঠার-উনিশ হবে, বেশ লক্ষ্মী-প্রতিমার মত রূপ! তারাও অর্থাৎ সে আর তার স্বামী সেই দিনই এসে পৌঁচেছে, কিন্তু তারা সেদিন মন্দিরে যাবে না, সুতরাং তাড়া নেই! মেয়েটির সঙ্গে গল্প ক'রে অনেকদিন পরে মায়ের বড় আনন্দ হ'ল—কারণ এদেশে এসে অবধিই প্রায় মুখ বন্ধ, যা কিম্ভূতকিমাকার ভাষা এদের, না যায় একবর্ণ বোঝা, আর না যায় আমাদের কথা বোঝানো।

প্রায় আধঘণ্টা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর মাতৃদেবী কল পেলেন। তবু রাজপুত বৌটি স্বার্থত্যাগ ক'রে তাঁ'কে আগেই ছেড়ে দিলে। বললে, আমরা ত আর মন্দিরে যাব না, আপনি সেরে নিন্—

স্নান সেরে সবাই বেরিয়ে পড়লুম। গাইডকে জিজ্ঞাসা করলুম, মন্দির কতদূর? সে বললে, এইত!—সুতরাং স্থির করলুম কষ্টদায়ক 'ঝট্কা'য় চড়ার চেয়ে সামান্য পথ হেঁটেই যাওয়া যাবে! কিন্তু ও হরি! কোথায় মন্দির? যত পথ চলি, মন্দিরও তত দূরে সরে যায়—পথ আর ফুরোয় না। মায়ের ত অবস্থা কাহিল, তিনি চল্‌তেই পাচ্ছেন না। দেরি

হয়ে যাচ্ছে ব'লে গাইডকে সরল বাংলায় গালাগাল দিচ্ছি, আর পথ চলতে চলতে ভাবছি যে বাংলা থেকে মাদ্রাজে এসেই রোদের এই অবস্থা, যারা বিষুবরেখার উপরে বাস করে, তারা বাঁচে কি ক'রে ?

অবশেষে এক সময়ে সত্যিই মন্দির পাওয়া গেল। একটা পথের মোড় ঘুরতেই সহসা আমাদের চোখে পড়ল পাষাণ-নির্ম্মিত বিরাট গোপুরম্! আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম। শ্রীরঙ্গমের গোপুরম্ বা সিংহদ্বার দেখেই আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম কিন্তু মীনাক্ষি মন্দিরের কাছে সে-ও অকিঞ্চিৎকর। কত সহস্র মানুষের মাথার ঘাম এবং বুকের শোণিতে পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বিপুল দৈত্য! দেবমন্দির নির্ম্মাণের পেছনে মানুষের যে ঐশ্বর্য্যের দম্ভ আত্মগোপন ক'রে থাকে, সেই দম্ভই কি আজ পাষাণে রূপ নিয়েছে!

মা মুগ্ধ হয়ে বার বার বল্‌তে লাগলেন, চমৎকার, কোন দেশে বোধ করি এ সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই! কিন্তু আমি ভাবতে লাগলুম সেই সব হতভাগ্যদের কথা—যারা তিল তিল ক'রে নিজেদের ক্ষয় ক'রে এই পাষাণস্তূপকে গড়ে তুলেছে! হয়ত তারা তাদের শ্রমের মূল্যও পায়নি, অর্দ্ধাশনে, অনশনে খেটে গেছে দিনের পর দিন। তারা বঞ্চিত ক'রেছে নিজেদের আত্মাকে, সন্তানদের আত্মাকে, তাই এই সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের প্রতিটি রন্ধ্রে এখনও মাথা কুটে বেড়াচ্ছে তাদের দীর্ঘশ্বাস।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দর্শক যেদিকে চেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়েছে, সেই দিকে চেয়ে চেয়েই কে জানে কেন আমার কেমন ভয় করতে লাগল।

কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থাপত্য শিল্পের বিচার কিম্বা দার্শনিক চিন্তা, কোনটারই সময় ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরে ঢুকে পড়লুম। একটি প্রাচীরের মধ্যে আর একটি ক'রে প্রাচীর এবং এক-একটি দ্বার—দক্ষিণের মন্দির সবই প্রায় এই-রকম। মধ্যের জায়গাগুলিতে নানা ব্যাপার থাকে। কিন্তু মীনাক্ষি মন্দিরে ঢুকে দেখলুম সে এক বিরাট নগর। কতরকম যে বাজার আছে মন্দিরের প্রথম প্রাচীরের মধ্যে, তার ঠিকানা নেই। শুধু—দর্জ্জির কারখানাই প্রায় শ-দেড়েক হবে। শুনলুম 'দীপাবলী' বা দেয়ালী উৎসবের জন্য দর্জ্জিরা এখন খুব ব্যস্ত! আমাদের যেমন পূজার সময় নূতন কাপড়-জামা প'রতেই হয়, ওদের তেম্‌নি দেয়ালীতে। আমরা যে কতগুলো বাজার এবং প্রাচীর পেরিয়ে মূল মন্দিরের কাছাকাছি এলুম, তার হিসেব আর মনে নেই। এইখানে এসে পূজার ফুল ও অন্যান্য উপকরণ কেনা গেল। উপকরণ ত ছাই—আরতির জন্য একটু কর্পূর, একটু কুঙ্কুম ও একটা নারকেল। কর্পূরটা জ্বেলে ঠাকুরের মুখের কাছে ধরবে, নারকেলটা ফাটিয়ে দেবে ও কুঙ্কুমটা পায়ে ঠেকাবে—এই হ'ল এদের পূজো, দেখে দেখে চোখ ক্লান্ত!

যাই হোক্—তাই নেওয়া গেল এবং এক সময়ে এক অন্ধ-পথের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে গাইড বললে এই 'মীনাক্ষী দেবী!' দোরের কাছে পাণ্ডারা ছিল, তারা বল্‌লে, 'যদি ব্রাহ্মণ হও ত ভেতরে চলে যাও—'

আমরা আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ভেতরে ঢুকলুম, অবশ্য সেই গলিপথের শেষ সীমাটুকু পর্য্যন্তই গতি নির্দ্দিষ্ট, মায়ের কাছে যাবার হুকুম নেই। দক্ষিণের সমস্ত মন্দিরে এই যে পদে পদে বাধা, এই বাধা মনকে তিক্ত ও সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে। ভগবানের মন্দিরে তাঁর সন্তানরা যায় পূজো দিতে, শুদ্ধবাসে ও যথাসম্ভব শুদ্ধ মন নিয়ে যায় নিশ্চয়ই—সেখানে এত বাধা কিসের জন্য? এখানে এসেই বুঝেছি, মহাত্মাজী হরিজন আন্দোলন নিয়ে কেন এত মাতামাতি করছেন। অনার্য্য দক্ষিণীদের মধ্যে জন্মেছেন এবং বহুদিন কাটিয়েছেন ব'লেই তাঁর কাছে এ আন্দোলনের এত বেশী মূল্য; চিরকাল যারা আর্য্যাবর্ত্তে মানুষ, তারা এর অর্থ বুঝবে না!

আমার মনে হ'ল এইজন্যই দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে তীর্থযাত্রীদের মন সাড়া দেয় না। এই ত' সমস্ত দক্ষিণের তীর্থই ঘুরলুম, কিন্তু এর কোনও স্মৃতি আজ আর আত্মায় আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে নেই; না এ দেশ, না এ দেশবাসী, কারুর সঙ্গেই আমাদের প্রাণের যোগ খুঁজে পেলুম না। কিন্তু দেখেছি আমি বহুদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে, দেখেছি অসংখ্যবার

একটি জৈন মন্দির—চিতোরগড়।

শ্রীক্ষেত্রে রত্নবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের ভক্তি, দেখেছি তার ব্যাকুলতা! সুদূর রাজপুতানায় শ্রীনাথজীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছি ভগবানের প্রেমে মানুষ কতদূর আত্মহারা হয় এবং সে-সব স্থানের স্মৃতি আজও আমার দেহের প্রতি রক্তকণাকে আনন্দচঞ্চল, উদ্বেল ক'রে তোলে! বহুবার যাওয়া এই সব তীর্থ তাই এখনও পুরোনো হয়নি, মনে পড়লেই আবার যাবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মীনাক্ষীর পূজা শেষ ক'রে বেরিয়ে এলুম। প্রচুর দক্ষিণাতুষ্ট পূজারীর দল মীনাক্ষির ভোগের প্রসাদ থেকে একটা তেলেভাজা ডালের বড়া এনে দিলে, সেই বড়া ও মালাসুদ্ধ নারকেল প্রসাদ শিরোধার্য্য ক'রে আমরা গেলুম সুন্দরেশ্বর শিবের দর্শনে। শুনলুম সেদিন সুন্দরেশ্বরের অন্নময়-রূপ পূজা হবে, বেলা তিনটার সময় এলে দেখা যেতে পারে। ব্যাপার অবশ্য এমন কিছু নয়—আসল শিবলিঙ্গটিকে প্রচুর গরম ভাত ঢেলে ঢাকা দেওয়া হবে এবং যথারীতি পূজা ও আরতি হবে।

সুন্দরেশ্বর দর্শন ক'রে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ দেখ্‌তে লাগলুম। সুন্দরেশ্বরের মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে এক কষ্টি-পাথরের চত্তর পড়ল, তার এক একটি স্তম্ভে হর-গৌরীর নানারূপের মূর্ত্তি খোদিত। কোনটায় বা শিব বৃষভ-বাহনে বিবাহ করতে চলেছেন, কোনটায় দেখা গেল, বিষ্ণু শিবের হাতে কন্যা সম্প্রদান করছেন—ইত্যাদি।

বাস্তবিক পাথরে খোদাই বহু মূর্ত্তি দেখেছি, বিশেষ ক'রে দক্ষিণ ভারতে ত' এর অভাব নেই কিন্তু এমন আশ্চর্য্য কারিগরি আর কোথাও দেখিনি। পাষাণের রেখায় এত অর্থ, এত **expression** দেওয়া যায়? প্রতিটি মুদ্রা আঙ্গুলের বিভিন্ন ভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, চোখের ভ্রূর ভঙ্গিমা পর্য্যন্ত প্রত্যেক মূর্ত্তিটির অতি পরিষ্কার। বিশেষ ক'রে কন্যা সম্প্রদানের মূর্ত্তির কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ ত' আর মুখে কথাই বেরুল না। বিষ্ণু শিবের হাতে গৌরীর একখানি হাত দিয়ে দিচ্ছেন, গৌরী সলজ্জভাবে ঘাড়টি হেঁট ক'রে রয়েছেন, বিষ্ণুর মুখে পরিহাসের হাসি—কিন্তু তারই সঙ্গে যেন গভীর স্নেহ মেশানো এবং শিবেরও ঈষৎ সলজ্জ নতমুখ, আর তারই মধ্যে তিনি অপাঙ্গে গৌরীকে দেখবার চেষ্টা করছেন; তাঁর দৃষ্টি প্রসন্ন, হস্তে বরাভয়। সমস্ত ভাবটি এত নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে যে, মনে হয় এক রঙের পাষাণের গায়ে, শিল্পীর লৌহের আঘাতে এ সম্ভব হয়নি, তার সাধনায় পাষাণ প্রাণ পেয়েছে।

মন্দিরের মধ্যেই একটি সরোবর আছে, সেইখান থেকেই দেবীর স্নানের জল যায় শুনলুম; তারই চারপাশে চত্তরে নানা বর্ণের ছবি আঁকা। তার মধ্যে মীনাক্ষি মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও ছিল। এইখান থেকেই গাইড্ আমাদের মূল-মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়াটি দেখালে। মূলমন্দিরের চূড়া ছোট ব'লে আর কোথাও থেকে দেখা যায় না।

এখান থেকে বেলা একটা নাগাদ আমরা বাসায় ফিরে এলুম। সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমা, মায়ের উপবাস। সুতরাং আমরাও আর রান্নার চেষ্টা করলুম না। গাইডটির চেষ্টায় বহু কষ্টে এক গুজরাটী হোটেল খুঁজে বার করা গেল। সেইখান থেকে পাঁচসিকে সের দিয়ে ঘিয়ে ভাজা পুরী আনিয়ে আমরা ভোজন শেষ করলুম। আহারের পর আমি আর বিশ্ববাবু বিশ্রাম করতে লাগলুম, মা আস্তে আস্তে বেরিয়ে সকালের রাজপুত মেয়েটির খোঁজ করতে গেলেন।

সেখান থেকে ফিরে এসে মা জানালেন যে, আজ স্টেশনে বড় ভিক্টোরিয়া গাড়ী দেখেছেন, সেই গাড়ী ভাড়া করতে হবে। ঝটকায় তিনি আর চাপবেন না।

অগত্যা স্টেশনে গিয়ে সেই গাড়ীই ভাড়া ক'রে আনা হ'লো। গাইডটির কাছে জানা গেল যে, সমস্ত মাতুরা শহরে ঘোড়ার গাড়ী মাত্র দু-তিনখানিই আছে। বাকী সবই ঝটকা অর্থাৎ গরুর গাড়ী।

রাজপুত দম্পতিকে টেনে বার করা গেল। ছেলেটিরও বয়স অল্প, বোধকরি, বাইশ তেইশ হবে, বেশ শান্ত চেহারা। গাড়ীটা বড় ছিল, অনায়াসে আমাদের পাঁচজনকেই ধরল।

প্রথমেই আমরা গেলাম টেপাকুলম সরোবর দেখতে। প্রকাণ্ড একটি পুকুর, শহরের এক প্রান্তে। তার মাঝখানে একটি ছোট প্রমোদ ভবন! মধ্যে মধ্যে সুন্দরেশ্বরের প্রতি-

নিধি এখানে আসেন, তদুপলক্ষে উৎসবাদি হয়। নৌকা এবং মাঝি তৈরী ছিল, আমরা ওপারে গিয়ে বেশ ঘুরে ফিরে সব দেখে এলুম। এ ছাড়া এখানের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে রাজা তিরুমল নায়েকের প্রাসাদই প্রধান। আমরা শহরের বাইরে দিয়ে অসংখ্য গেঞ্জি ও মোজার কল দু'পাশে ফেলে রেখে চল্‌লুম সেই প্রাসাদের দিকে। শুনলুম এই রাজার সময়তেই মাদুরা বড় শহর হয়ে ওঠে; অর্থ ও প্রতিপত্তি এঁর এতদূর পর্য্যন্ত ছিল যে, তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের ইনি গ্রাহ্যই করতেন না।

প্রাসাদে ঢুকে দেখলুম যে, সত্যিই তা দেখবার জিনিস। ইটের গাঁথুনি ও চূণবালির কাজ বটে কিন্তু এমন Solid সে বাড়ীর গাঁথুনি এবং এত সুন্দর সেই চুনবালির কাজ, যে দেখে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এতদিনেও সে কারু-কার্য্যের বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। প্রাসাদটিতে ইংরেজ সরকার সম্প্রতি জেলা আদালত ও কালেক্টরের অফিস বসিয়েছেন। যে প্রাসাদ একদা দাম্ভিক ও শক্তিশালী রাজার স্বপ্ন দিয়ে তৈরী হয়েছিল, সে প্রাসাদ আজ নিতান্তই দারোয়ান ও কবু-তরের বাসায় পরিণত হয়েছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা কাপড়ের বাজারে ঢুকলুম। এখানে যে-সব সম্ভ্রান্ত কাপড়ের দোকান, তাদের অদ্ভুত পণ্য-বিক্রয়ের রীতি। বাইরে থেকে দোকান ব'লে কিছুতেই বোঝা

যাবে না। নিতান্তই সাধারণ সদরদোর, তাতেও আবার পর্দ্দা ঝোলানো। সেইখান দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকে তবে দোকানে পৌঁছোনো যায়। আমাদের ত' প্রথমে ঢোকবার সময় রীতিমত ভয়ই হয়েছিল।

এ'দোকান ও'দোকান ক'রে মায়ের সাড়ী কেনা ও আমার চাদর কেনা চল্‌ল। মাদ্রাজী সাড়ী ও মাদ্রাজী চাদরের প্রধান আড্ডা এই মাতুরাই ; সুতরাং বৈচিত্র্য এবং মহার্ঘ্যতার অভাব ছিল না।

কাপড় কেনা শেষ ক'রে আবার মন্দিরে যাওয়া গেল, উদ্দেশ্য আরতি দেখা ও বাসন কেনা। আমি যতদূর সম্ভব তাড়া লাগিয়ে শেষের কাজটা সংক্ষিপ্ত ক'রে বাসায় ফিরে এলাম। বাসায় ফিরে আবার গেলাম একটু গরম দুধের সন্ধানে, রাত্রের জলযোগ শেষ করবার উদ্দেশ্যে।

আরপর আবার জিনিস পত্র বাঁধবার পালা। সেই রাত্রেই ট্রেণ, এখান থেকে তাঞ্জোর যাবার ঐ গাড়ীই সুবিধা।

ক্রমে যাত্রার সময় এগিয়ে এল। রাজপুত মেয়েটি অশ্রু ছল ছল চোখে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বোধ হয় এরই মধ্যে আমাদের সে স্বজন ব'লে মনে করতে শুরু করেছিল। আর্য্যাবর্ত্তের লোক দাক্ষিণাত্যে এলে এমনিই হয়।

'আচারী'দের মহাতীর্থ

চিংলিপুট থেকে আমরা বিজয়াদশমীর দিনই যাত্রা করলুম, এবার শ্রীরঙ্গম্। দশমীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল প্রান্তরের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল বাঙ্গলা দেশের কথা, আজকের মহোৎসবের কথা। এই দিনটিতে আমি কোথাও যাই না বাড়ী থেকে—তার কারণ, এই দিনটি সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে একটা অসাধারণ মোহ আছে। যে-সব বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আমার কৈশোর কেটেছে আজ তাদের অনেকেই নানা কাজে ব্যস্ত, বছরের বাকী ক'দিন তাদের হদিশ পাই না কিন্তু ঐ একটি দিন আবার তারা কাছে আসে, আবার সেই আনন্দ সমারোহের কথা মনে পড়ে, আবার মনে পড়ে নানা রঙ্গে বিচিত্র কৈশোরকে। মনে হয়, কে বলেছে আমার কৈশোরকে বহুদিন পেছনে রেখে এসেছি, যৌবনও আমার যায়-যায়? মিথ্যে কথা।

বাইরের দিগন্ত বিস্তৃত, জনমানব চিহ্নশূন্য, মৃত প্রান্তরের দিকে চেয়ে চেয়ে ঐ দিনটির কথাই ভাবতে লাগলুম। রাস্তায় এইবার বোধ হয় জনসমাগম কমে এসেছে, গৃহস্থ-বাড়ীর মিষ্টান্নের ভাণ্ডার খালি হ'তে বেশী দেরী নেই—বারোয়ারী তলাও জনশূন্য, শুধু সেখানে হয় ত সেই অনেক

বাতির আলোটা এখনও নিঃশব্দে জ্বলচে! এক কথায় বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা কেটে গেছে, উৎসবের সন্ধ্যা, আনন্দের সন্ধ্যা—আমাকে বাদ দিয়েই! যাক্—ও সব সেন্টিমেণ্টালিটি এইবার কেটে যাক্, যে শারদ জ্যোৎস্না বাঙ্গলা দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, তা এবার ম্লান হয়ে এসেছে ; এবার দৃষ্টি ট্রেণের ভেতর দিকে।

মাদ্রাজের আগে পর্য্যন্ত অন্ধ্র সভ্যতা আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল, এইবার আমরা দ্রাবিড়দের মধ্যে এসে পড়েছি। গাড়ীতে এবার যারা উঠ্ছে তাদের সকলকারই অঙ্গে পূরো দ্রাবিড় সভ্যতার ছাপ মারা ; পুরুষদের মাথার সামনে দিকটা কামানো, পিছনে প্রকাণ্ড ঝুঁটি, কাছা খোলা কাপড় পরা, হাত-কাটা কামিজ গায়ে, কাঁধে একটা চাদর আর খালি পা ; এই এদের জাতীয় পোষাক। ধনী-দরিদ্র সকলেরই এই এক পোষাক ; শুধু ধনীদের ঐশ্বর্য্যচিহ্ন থাকে তাদের মূল্যবান চাদরে। যারা দরিদ্র তাদের চাদর খাটো, কখনও শুধু তোয়ালেতেই পর্য্যবসিত। যারা একেবারে দরিদ্র, তারা শুধু একটা ন্যাকড়া দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে—তাদের উলঙ্গ বলাই উচিত।

অন্ধ্রদেশ অনেক এগিয়ে এসেছে, আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসীদের সঙ্গে বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহারে অনেক মিল ; কিন্তু তামিলরা এখনও সেই দশ হাজার বছর আগেকার দ্রাবিড় সভ্যতাকে

আঁকড়ে ধ'রে আছে। এদের মত **conservative** ভারতবর্ষে বোধ হয় কোথাও নেই। মহাত্মাজী দক্ষিণ ভারতে থাকেন ব'লেই হরিজন আন্দোলন নিয়ে অত মাতামাতি করেন। এরা নিজেরা অনার্য্য—খুব সম্ভব এদের অনেকের রক্তে এক বিন্দুও আর্য্যরক্ত মেশেনি কখনও, সেই জন্যই স্পর্শদোষের মুখোস পরে নিজেদের হিন্দুত্ব প্রচার ক'রতে চায়—সেই জন্যই এদের দেব মন্দিরেও দর্শনার্থীর প্রবেশাধিকার নেই!···

আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে শ্রীরঙ্গম্ স্টেশন এসে পোঁছল যখন, তখন দশমীর চাঁদ অস্ত গেছে, গাঢ় অন্ধকার! শ্রীরঙ্গম্ স্টেশন ছোট, কারণ অধিকাংশ লোকই ত্রিচী কিম্বা ত্রিচিনোপল্লী স্টেশনে নামে; আর যারা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের কারখানার সঙ্গে জড়িত তারা যায় গোল্ডেন রক স্টেশনে। শহরটির এই চারটে স্টেশন। গোল্ডেন রকে রেলের কারখানা ত্রিচিনোপল্লী ও ত্রিচী হ'ল শহরেরই ছুটি স্টেশন—মাইল ছুই মাত্র তফাৎ।

ত্রিচিনোপল্লী শহরের এক প্রান্তে বিরাট শ্রীরঙ্গমের মন্দির, সেই মন্দিরেরই বাইরের ছুটি প্রাচীরের মধ্যে একটি বড় গোছের পল্লী গ'ড়ে উঠেছে, সেই গ্রাম ও মন্দির উপলক্ষ্য ক'রে এই স্টেশনের সৃষ্টি। স্টেশনের বাইরে গুটিকতক 'ঝটকা' বা গরুর গাড়ীর মত মাথায় ছৈ দেওয়া ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল,

তারই একটায় চেপে বসে আমরা সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে কোন্ এক নাম-না-জানা ধর্ম্মশালার উদ্দেশে যাত্রা করলুম। সঙ্গে একটি সামান্য হিন্দী জানা পাণ্ডার ছড়িদার মত ছিল, সেই লোকটিই ভরসা।

স্টেশনের সীমানা ছাড়াতেই শহরের আলো পাওয়া গেল, কিছু দূর যাবার পর প্রকাণ্ড একটা তোরণ পেরিয়ে আমরা শ্রীরঙ্গম্ পল্লীতে ঢুকলুম। এই তোরণ আর প্রাচীরটি, আমাদের ছড়িদার জানিয়ে দিলেন, মন্দিরেরই প্রথম প্রাচীর ও তোরণ। বাজার, শহর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা সব এই প্রাচীরের মধ্যে, অর্থাৎ সত্যি-সত্যিই যদি এটাকে মন্দিরের অংশ ব'লে ধরা যায় ত মন্দিরের বিস্তার কল্পনা করা যায় না।

বাজার, জলের কল ও এমনি আর একটা তোরণ পেরিয়ে মন্দিরের প্রধান গোপুরম্ বা সিংহদ্বার বাঁয়ে রেখে আমরা প্রকাণ্ড চওড়া একটা রাস্তায় এসে পড়লুম, বুঝলুম যে এটা রথের রাস্তা। দক্ষিণের সব মন্দিরের কাছেই একটা ক'রে খুব চওড়া রাস্তা পাওয়া যায়, কারণ বড় বড় রথ এবং তদুপযুক্ত জনসমাগম, তা নইলে সংকুলান হওয়া

এইবার ধর্ম্মশালা এল। ধর্ম্মশালাটি ছোট, নির্জ্জন এবং বেশ পবিষ্কার। কোন্ এক মাড়োয়ারী তার সঞ্চিত অর্থের কিছু খরচা ক'রে ধর্ম্মশালাটি তৈরী ক'রে দিয়েছে। ভেতরে

একটি মন্দির আছে, তারই পূজারী হলেন ধর্ম্মশালার রক্ষক। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, তবে 'আচারী' সম্প্রদায়ভুক্ত। খুব সম্ভব ধর্ম্মশালার মালিকও ঐ সম্প্রদায়ের, কারণ বাড়ীর ফটকেও আচারীদের বিখ্যাত ত্রিপুণ্ড্রক ও শঙ্খ-পদ্ম চিহ্ন আঁকা রয়েছে। রামানুজাচার্য্য যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন, সেই ধর্ম্ম-মতের যারা উপাসক তাদেরই বলে 'আচারী'। খুব সম্ভব 'আচার্য্য' এই শব্দ থেকেই আচারী শব্দের উৎপত্তি। এদের প্রধান ধর্ম্ম-গুরু হলেন আচার্য্য এবং শ্রীরঙ্গমের আগে যাঁরা মোহান্ত হতেন তাঁরাই এই আচার্য্য পদ পেতেন। আচারীদের কপালে সাদা ও লালে আঁকা ত্রিপুণ্ড্রক থাকে এবং বাড়ী বা মন্দিরের সদরে ঐ ত্রিপুণ্ড্রকের সঙ্গে থাকে একপাশে একটি শঙ্খ ও অপর পাশে পদ্ম। এরা চতুর্ভূর্জ বিষ্ণু মূর্ত্তির উপাসক। দক্ষিণের সর্ব্বত্র এই সম্প্রদায়ের মন্দিরই বেশী। আর্য্যাবর্ত্তেও বহু স্থানে আচারীরা মন্দির স্থাপন করেছে, বৃন্দাবনের বিখ্যাত সোনার তালগাছ (ঘণ্টাস্তম্ভ)-ওলা রঙ্গজীর মন্দির এই আচারীদের। সম্প্রতি যাঁরা পুষ্করে গেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন যে, আচারীদের এক বিরাট মন্দির সেখানেও স্থাপিত হয়েছে।

একটা কথা এখানে উল্লেখ করি, এই সমস্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সময়েই সুদূর দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গম্ মন্দির থেকে আগুন যায় এবং সেই আগুনই মন্দিরের মধ্যে বরাবর নানা ইন্ধন ও আধারে জ্বালিয়ে রাখা হয়।

ধর্ম্মশালাটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন—যা সাধারণ ধর্ম্মশালায় দেখতে পাওয়া যায় না। তার কারণ, বোধ হয় যাত্রী সমাগম কম। এখানে পাণ্ডা ঠিক নেই, তবে পাণ্ডা নামধারী দু'একজন লোক আছে, তারাই নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে যাত্রীদের তোলে এবং টাকাটা সিকেটা যা' পায় তা'তেই খুশী। আমরা কিন্তু ধর্ম্মশালাই insist করেছিলাম ব'লে এই ব্যবস্থা। যাই হোক—তখনও দু' এক ঘণ্টা রাত্রি ছিল কাজেই আমরা বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম এবং মনে মনে মাড়োয়ারীদের ধন্যবাদ দিতে দিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলুম। বেচুক ওরা ঘি বা ঘৈ—কিন্তু ধর্ম্মশালা ত সর্ব্বত্র একটা দু'টো ক'রে রেখেছে! তার কৃতজ্ঞতা কি কম?

সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে আমরা কাবেরী তীরে যাত্রা করলুম। কাবেরীই দুটি ভাগ হয়ে গিয়ে শ্রীরঙ্গমকে ঘিরে রেখেছে—বস্তুতঃ স্থানটি একটি দ্বীপ। গোদাবরীর কর্দ্দমাক্ত জল দেখে মনে মনে কাবেরী সম্বন্ধেও ভীত হয়েছিলুম, কিন্তু গিয়ে দেখলুম কাবেরীর জল, অন্তত এখানে, অতি নির্ম্মল। আরামে স্নান করলুম, তারপর তীর্থকৃত্য সেরে মন্দিরের দিকে যাত্রা করা গেল। একটা কথা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না যে, এরা শুধু দ্রাবিড় জীবনযাত্রার পদ্ধতিকেই যে এখনো আঁকড়ে রেখেছে তাই নয়, দ্রাবিড় দেবদেবীদের পর্য্যন্ত ভুলতে পারে নি। দ্রাবিড়দের প্রধান

উপাস্য সর্প যুগলের (দু'টি সাপে জড়ানো—পাথরের গায়ে খোদাই করা যে মূর্ত্তি আমরা প্রায়ই ইতিহাসের বইএ দেখে থাকি) মূর্ত্তি এখানে চারি দিকে ছড়ানো এবং এখনও নানা নামে তার পূজা হয়। দক্ষিণের সর্ব্বত্রই এই দেবতার মূর্ত্তি দেখেছি, মন্দিরের মধ্যে, নদীর ধারে, রাস্তার পাশে, কোনও গাছের গোড়ায়—সর্ব্বত্র! সব চেয়ে বেশী নজরে পড়েছে শ্রীরঙ্গম আর কাঞ্জীভেরমে। এখানে কাবেরীর ধারে একটি বিপুল বটগাছের গোড়া বাঁধানো, আর তারই উপর গোল ক'রে সার দেওয়া ঐ সর্প-দেবতার মূর্ত্তি। আমাদের ছড়িদার লক্ষ্মণ সিং (যে লোকটি রাত্রে আমাদের ধরে এনেছিল সে নয়—সে-ই এই হিন্দুস্থানী ছড়িদারটিকে সকালে দিয়ে গেল) জানালে, যে সব রমণীর ছেলে হয়েছে তারা এবং যা'দের এখনও হয় নি তারাও এইখানে পূজো দিতে আসে, অর্থাৎ ইনি ষষ্ঠীদেবী!

লক্ষ্মণ সিংহের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমরা ঝটকায় চেপে শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরে এসে পড়লুম। বিপুল গোপুরম্ অর্থাৎ প্রধান প্রবেশদ্বারের চার পাশে এবং ভেতরে এমনভাবে বাজার গড়ে উঠেছে যে, কাছে এলে তার বিরাটত্ব নজরেই পড়ে না। কিন্তু পাশ থেকে বা দূর থেকে দেখলে কিম্বা অন্য তিনটি গোপুরম্ দেখলে বোঝা যায় যে, কি প্রচুর অর্থব্যয়ে এবং কতগুলি লোকের প্রাণান্ত সাধনায়—এই বিপুল পাষাণস্তূপ গড়ে উঠেছে। এগার-বারো তলা সমান উঁচু পাথরের সৌধ—

তার প্রতিটি রন্ধ্র অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে পূর্ণ! কতদিন এবং কত লোকই না লেগেছে এর এক একখানি পাথর খোদাই ক'রতে! আর স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে কি অসাধারণ জ্ঞানও ধারণা থাকলে এতগুলি লোকের মিলিত হাতের কাজকে চালিত ক'রে এমন নিপুণ ও সুষ্ঠু ভাবে এই বিশাল পাষাণ সৌধ গড়ে তোলা যায়! কোথাও এর একটি রেখা বেঁকে যায় নি, কোথাও কোনও পাথর বসাতে ভুল হয় নি!

আরও দু'টি-তিনটি তোরণ অর্থাৎ দুটি তিনটি বাজার পেরিয়ে আসল মন্দিরের কাছাকাছি এসে পড়লুম। কিন্তু শুনলুম যে একে সেদিন শনিবার, তায় একাদশী। সুতরাং সেদিন সওয়ার বেরোবে। দক্ষিণের সব দেবতারই মূল মূর্ত্তি হয় পাষাণের। তিনি প্রায়ই নিরাভরণ থাকেন এবং কখনই সে কারাগারের বাইরে যেতে পাননা। তাঁর প্রতিনিধি থাকেন, সুবর্ণ মূর্ত্তি; তিনি নানা ছল-ছুতোয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্বর্ণ নির্ম্মিত যান বাহন চ'ড়ে হামেসা হাওয়া খেতে যান। মানে, পুতুল খেলার সখটা তাঁর ওপর দিয়ে মিটিয়ে নেওয়া হয়। যাই হোক্—যতক্ষণ না সে সওয়ার বেরোয় ততক্ষণ দর্শন হবে না, এই দুঃসংবাদ শুনে আমরা রীতিমত দমে গেলুম এবং ঘুরে ঘুরে মন্দিরটা দেখতে শুরু করলুম।

আজকাল ওখানে আর মোহান্তরাজ নেই, শুনলুম গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত ট্রাষ্টীরা মন্দিরের দেখাশুনা করেন। তাঁরা মাসে এক

দিন ক'রে দেবতার ঐশ্বর্য্য সব ঠিক আছে কিনা তাই দেখতে আসেন, সেই দিন সমস্ত অলঙ্কার মণি-মাণিক্যের ভার বাইরে এনে তাঁদের দেখানো হয়। সৌভাগ্যক্রমে সেই দিনই পরি-দর্শনের দিন পড়েছিল। কলকাতার সিনেট হলের মত বিরাট একটা দালানে প্রকাণ্ড টেবিল পেতে শ্রীরঙ্গজীর অলঙ্কার বার ক'রে সাজানো হ'ল, আর বড় গোছের যা' আসবাব তা পাশে পাশে মেঝেতেই রাখা হ'লো। এমনি তিন দফা আমরা সেদিন দেখেছিলুম। আরও ছিল কি না জানি না। তার মধ্যে এক দফা ছিল শুধু মণিমাণিক্যের গহ্না। দেবতার নামে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য জমে আছে, না জানি কোন্ সুলতান মামুদের প্রত্যাশায়।

মন্দিরটি বহুদিনের। টাইম টেবিলের কথা যদি ঠিক হয় তা'হলে নবম শতাব্দী অর্থাৎ বারশ'বছরের মন্দির এটি। পাথরের কারুকার্য্য এবং স্থাপত্যের বিপুলত্ব ত দেখবার মত বটেই, এ ছাড়া অজন্তার ধরণে এখানেও দেওয়ালে বা ছাদের গায়ে ছবি আঁকা ছিল তারও কিছু চিহ্ন এখনও আছে। অধিকাংশ স্থলেই সে ছবি উঠে গেছে, সেখানে চূণ লাগিয়ে আধুনিক কালের পট আঁকা হয়েছে, কিন্তু মূল মন্দিরের পাশে, যেখানে পাখীর খাঁচাগুলি আছে সেই খানে গিয়ে ওপর দিকে চাইলে এখনও সেই ছবিগুলি দেখা যায়। অজন্তারই মত কালের অত্যাচারে এবং মশাল ও প্রদীপের ধোঁয়ায় তা বিবর্ণ, কালো

হয়ে এসেছে, কিন্তু সেগুলি যে, ঠিক অজন্তার পদ্ধতিতেই আঁকা হয়েছে তা আজও লক্ষ্য ক'রে দেখলে বোঝা যায়।

মন্দিরের মধ্যে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে লক্ষ্মীর মন্দির, লক্ষ্মণের মন্দির, বিপুল গরুড় মূর্ত্তি (এত বড় গরুড় আর কোথাও নেই) প্রভৃতি দেখে আবার এসে বসলুম। ততক্ষণে খুব ভীড় জমে উঠেছে কিন্তু দোর খোলার তখনও অনেক দেরী। বার-দুই ভোগ হ'য়ে গেল, তার প্রসাদও বিক্রী হ'ল কিন্তু দেবতার দেখা নেই! খিচুড়ী ভোগ, অর্থাৎ দুই একটি ডালের ফোড়ন দেওয়া সাদা ঘি-ভাত, তাই ডেলা ডেলা ক'রে বিক্রী হয়! আর পাওয়া যায় খুব সামান্য ডাল (ডেলা পাকানো) এবং দুই একখানি চালের গুঁড়ির মালপো!

প্রসাদ আমরাও কিছু কিনলাম। তারপর আরও ঘণ্টা-দুই বসবার পর দুপুর নাগাদ দোর খুল্‌ল। পূজার উপকরণ সামান্য এবং সর্ব্বত্রই এক রকম; কলা, নারিকেল, কর্পূর আর কুঙ্কুম! তাই একটি ডালায় ক'রে সাজিয়ে নিয়েছিলুম, কিন্তু ঢোকে কে? অন্ধকার, হাওয়াবাতাসহীন গহ্বরের মধ্যে থাকেন দেবতা—তার সঙ্কীর্ণ পথের সামনে প্রায় সহস্রাধিক লোক ঠেলাঠেলি করছে! দক্ষিণের আর কোনও মন্দিরে এত ভীড় দেখি নি।

যাই হোক্, অতি কষ্টে, মাকে নিয়ে বার তিনেক চেষ্টা করার পর, ঘণ্টা খানেক ঠেলাঠেলি করে ভেতরে পৌঁছলুম।

জানলা নেই, দরজা নেই, যথেষ্ট আলো নেই, তার মধ্যে অনন্ত-শয্যায় শায়ী বিরাট বিষ্ণুমূর্ত্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে মসীলিপ্ত ক'রে রাখা হয়েছে। তার ওপর সামনে একটি বালিশ এমন ক'রে সাজিয়ে রেখেছে যে, সহসা দেখলে মনে হয় ঐ বালিশটিই বুঝি মন্দিরের দেবতা। পূজারীদের চার আনা পয়সা দিলে তারা কর্পূরের আরতি করে (আরতি এ দেশের লোক করতে জানে না—শুধু কর্পূরটা জ্বেলে মুখাগ্নির মত সামনে ধরে)—তখন সেই আলোতে পিছনের তমিস্রা-শায়ী ভগবান্‌কে দেখা যায়।

আমার মনে হয়, সেকালে যত হিন্দুমন্দির তৈরী হ'ত, প্রত্যেকটিই জান্‌লা-দরজাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হ'ত শুধু এই জন্যে যে, বিপুল অন্ধকারের মধ্যে সামান্য আলোতে মধ্যের আধো আব্‌ছায়ায় ঢাকা দেবমূর্ত্তি দেখে রহস্যাবৃত অচিন্ত্য ভগবান্‌কে লোকে কল্পনা ক'রতে পারবে ব'লে। এখন সেটি যে পূজারীদের অর্থ উপার্জ্জনের উপায় হয়ে উঠবে, তা' বোধ হয় তাঁরা ভাবেন নি। এ বিষয়ে পুরীর মন্দিরই সবচেয়ে ভাল।

মন্দির থেকে বেরিয়ে বেলা দেড়টা নাগাদ ধর্ম্মশালায় ফিরলুম। আহারাদির পর বিশ্রাম করে বেলা সাড়ে তিনটার সময় আবার বেরুলুম ত্রিচিনোপল্লী দুর্গ দেখতে। ঝট্‌কায় ক'রে যেতে মাইল তিনেক লাগে, সেখান থেকে জম্বুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখিয়ে ফিরিয়ে আনতে এক টাকা ভাড়া। লক্ষ্মণ সিংহের জীবনের ইতিহাস শুনতে শুনতে কাবেরী পেরিয়ে

বৃষভবাহনে হরগৌরী মূর্ত্তি—শ্রীরঙ্গম্।

আমরা ত্রিচিনোপল্লী শহরে পড়লুন। লক্ষ্মণ সিংহের বাড়ী ফরাক্কাবাদে, সে আসলে রামেশ্বরের পাণ্ডা গঙ্গাধর পিতাম্বরের ছড়িদার; এখান থেকে যাত্রী সংগ্রহ করার জন্য তাকে রাখা হয়েছে! কিন্তু যেহেতু আমাদের অন্য পাণ্ডার লোক মাদ্রাজ থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিল, সেই হেতু সেদিকে তার সুবিধে হ'ল না। এই সব ক্ষেত্রে সে যাত্রীদের এইখানকার দর্শনগুলো করিয়ে দেয় এবং যা' বকশীশ পায় ও কাবেরীর পাণ্ডাদের কাছ থেকে যা' কমিশন পায় সেটা তার উপরি লাভ।

লোকটি বৃদ্ধ, একটু খিটখিট করা স্বভাব, কিন্তু সৎ ও পরিশ্রমী। সে তার ফরাক্কাবাদের ঘরকন্নার গল্প করতে করতে চল্‌ল, Background Music হিসাবে তার কথাগুলো শুন্‌তে শুন্‌তে কখন এক সময়ে ত্রিচিনোপল্লীতে এসে পৌঁছলুম।

ত্রিচিনোপল্লী বেশ বড় শহর, মাদ্রাজ ও মাদুরার পরেই বোধ হয়, এই প্রেসিডেন্সীতে ত্রিচিনোপল্লীর স্থান। রাস্তাঘাট জনবহুল ও কোলাহলমুখরিত। শহরের ঠিক মধ্যে ছোট কিন্তু দুর্গম পাহাড়ের শৃঙ্গে ত্রিচিনোপল্লী দুর্গ। কঠিন পাহাড়ের সূচ্যগ্র চূড়ায় এই দুর্জ্জয় দুর্গ তৈরী করা খুবই কঠিন এবং সেই জন্যই তা আজও লোকের বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে। নীচে থেকেই এর মহিমা ভাল বোঝা যায় এবং ঘুরে ঘুরে যখন দুর্গটি সম্পূর্ণ দেখলুম (নীচে থেকেই) তখন আমি সত্যই রীতিমত বিস্মিত হলুম। দুর্গের মধ্যে আগে একটি মন্দির ছিল, এখন

রাজার বাসভবনগুলিতেও বিভিন্ন মন্দির আছে। দুর্গ পর্য্যন্ত পৌঁছবার জন্য অধুনা একটি অতি সহজ সিঁড়ি তৈরী হয়েছে—মা লক্ষ্মণ সিংহকে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন দর্শন করতে, আমি নীচে ঘুরে ঘুরে উপরের বিরাট দুর্গ ও নীচের বিরাট জনতা দেখতে লাগলুম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওঁরা ফিরে এলেন, তখন আবার ঝট্‌কায় চড়ে জম্বুকেশ্বর মন্দিরে যাত্রা করা গেল। কাবেরীর পুল পেরিয়ে শ্রীরঙ্গম দ্বীপের মধ্যেই ঐ মন্দিরটি। এর গোপুরম্‌গুলো খুব উঁচু না হ'লেও প্রসারে মন্দিরটি বৃহৎ এবং কারুকার্য্যের দিক থেকে শ্রীরঙ্গমের থেকেও ভাল। সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপ যেটা, সেটার প্রতিটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করতে বোধ হয় দুটি কারিগরের ছ'মাস সময় লেগেছে। দক্ষিণের এই সব বিরাট মন্দিরের বিপুল শিল্পচাতুর্য্যের মধ্যে এসে আমরা হাঁপিয়ে উঠি, সব খুঁটিয়ে দেখার ধৈর্য্য বা শারীরিক অবস্থা থাকে না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ যখন একটি মূর্ত্তি কিম্বা স্তম্ভে নজর পড়ে তখন চম্‌কে উঠতে হয়। আর একটা কথা—প্রতিটি মূর্ত্তির—তা' সে যত ছোটই হোক না কেন—সকলকারই বিভিন্ন ভঙ্গীর বিভিন্ন মুদ্রা হাতে খোদাই করা। হাতের কোন্ ভঙ্গীর কি অর্থ তখন ধরা হ'ত তা এখন ত আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। তাই যখন উদয়শঙ্কর কি শঙ্করণ-নম্বুদ্রির নাচ দেখেছি তখন অনেক মুদ্রারই অর্থ বুঝি নি,

কিন্তু এখানে এসে বহু মুদ্রা জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল এবং সেটা হ'ল শুধু অনবরত দেখতে দেখতে··· ।

জম্বুকেশ্বর শিবলিঙ্গ, খানিকটা পাতালের মত নেমে গেলে তবে দর্শন হয়। অনেক কষ্টে প্রধান মন্দির এবং পার্ব্বতী মন্দির (কষ্ট এই জন্য যে, প্রায় মাইল তিনেক মন্দিরের মধ্যেই হাঁট্‌তে হয়), দেখে ক্লান্ত দেহে আমরা আবার শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরে এসে পৌঁছলুম। এবার উদ্দেশ্য বাজার করা। এখানকার বেতের কাজ বিখ্যাত। বিশেষ ক'রে বেতের এমন সুদৃশ্য ট্রে এরা প্রস্তুত করে যা' না দেখাল সম্ভব ব'লে মনে হ'ত না, কতকগুলির বেতের ট্রে আর চন্দন কাঠের মূর্ত্তি কিনে ধর্ম্মশালায় ফিরে এলুম। ত্রিচিনোপল্লীতে একটি গুজরাটির দোকান আছে, সেখানে ঘিয়ের খাবার পাওয়া যায়—সেইখান থেকেই কিছু সংগ্রহ করে এনেছিলুম, তাইতেই জলযোগ শেষ ক'রে আবার বিছানাপত্র গুছিয়ে স্টেশনে যাত্রা করা হ'ল। এবার সোজা রামেশ্বরম্। জয় রামেশ্বরম্।

শেষ করার আগে লক্ষ্মণ সিংহের একটা কথা ব'লে নিই ; লোকটি সারাদিন ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে রইল, আমাদের সঙ্গে ঘুরল, কথায় কথায় কত পরিচয় হ'ল, কিন্তু ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে যখন তার হাতে বকশীশের টাকাটি দিলুম—ব্যস্, লোকটি সঙ্গে সঙ্গে যেন বাতাসে মিশে গেল। একটা ধন্যবাদ জানালে না, কিম্বা বকশীশের অংশ কম হয়েছে ব'লে অনুযোগও

জানালে না—কোন রকম প্রিয় সম্ভাষণ, কোনও রকম প্রীতি জ্ঞাপন নেই—একটি কথাও না ব'লে, এমন কি ছোট্ট একটি বিদায় নেবার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত না দিয়ে লোকটি চলে গেল। সারা দিনের ঘনিষ্ঠতা যেন পদ্মপত্রের জলের মত কোথাও তাকে স্পর্শ করে নি, কর্ত্তব্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের আভাস পর্য্যন্ত তার মনে নেই, একেবারে গীতার নির্ম্মম পুরুষ!

সে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল যে, এই পৃথিবীর মধ্যে কোথাও সত্যকারের আত্মীয়তা নেই, সমস্তটাই মুসাফিরি। এমনি ক'রেই কয়েক ঘণ্টার আত্মীয়তাকে নির্ম্মমভাবে ত্যাগ ক'রে আবার নূতনের সন্ধানে যাত্রা ক'রতে হবে। পৃথিবীও খুঁজবে আবার নূতন যাত্রী! এই-ই এখানকার সত্য সম্বন্ধ।

নগাধিরাজের শ্রীচরণে

রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলের ছোট কামরার আরও ছোট বেঞ্চেতে শুয়ে ঝাঁকানি খেতে খেতে কখন যে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলুম তা জানি না, হঠাৎ এক সময়ে চম্‌কে উঠে দেখি—কী একটা ছোট স্টেশনে গাড়ী ঢুকছে। ঘড়ীর কাঁটাটার দিকে চেয়ে দেখলুম আমাদের দেশের সময় প্রায় পৌনে পাঁচটা অর্থাৎ আইনত এবার হলদোয়ানি পৌঁছানোই উচিত।

একটু পরেই একস্থানে গাড়ীটা এসে দাঁড়াল, বাইরের দিকে চেয়ে বোঝবার উপায় নেই কি স্টেশন, তবে সামান্য আলোর ব্যবস্থা দেখে মনে হ'ল, যে স্টেশন একটা বটে! মুখ বাড়িয়ে কুলীদের প্রশ্ন করলুম, 'কোন্ স্টেশন?'

জবাব এল, 'হলদোয়ানি।'

তখন 'ওঠ্-ওঠ্' আর 'বাঁধ-বাঁধ'। আমার সাহিত্যিক বন্ধু সুমথবাবুর বিছানার দড়ি নেই, একপাটি জুতো নি-পাত্তা, তার সে কী ব্যাকুলতা। ইন্দুরও তাই, মাষ্টার শিবু ভাগ্যিস্ জেগে ছিল; সে হুঁশিয়ার লোক চট্ ক'রে তার হ'লো। বিপদ সুমথকে নিয়েই—কোনমতে যখন তাকে প্রায় বিছানা সুদ্ধ জড়িয়ে নামানো গেল, তখন ট্রেণ চলতে শুরু করেছে।

টিকিট আমাদের দুজনের ছিল কাঠগুদাম পর্য্যন্ত, আর দু'জনের ছিল হলদোয়ানি। কাঠ গুদাম পর্য্যন্ত টিকিট কেটে কোন লাভ নেই, এসংবাদটা পূর্ব্বেই নিয়েছিলুম, কারণ বাসগুলো অধিকাংশই ছাড়ে হলদোয়ানি থেকে এবং ভাড়া দু' জায়গা থেকেই সমান; অথচ হলদোয়ানি থেকে কাঠ গুদাম, মাত্র সাড়ে তিন মাইল পথের জন্য ট্রেণে নেয় ছ' আনা!

যাই হোক্—হলদোয়ানির প্লাটফর্ম্মে পা দিয়ে দেখি তখনও চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। উষার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। পাহাড় আছে কি নেই বোঝা যায় না, তবে বেশ ঠাণ্ডা অথচ শুক্‌নো তাজা হাওয়া এসে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে আমরা নগাধিরাজ হিমালয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

কুলীদের প্রশ্ন করলুম, 'নৈনীতাল যাবার বাস কোথা?' তারা শুধু 'চলিয়ে না' ব'লে আমাদের মালপত্র তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল, আমরাও অগত্যা তাদেরই সাময়িকভাবে মহাজনের পদবী দিয়ে পদাঙ্ক অনুসরণ করলুম। স্টেশনে তবু আলো ছিল একটু, প্লাটফর্ম্মের বাইরে দেখি আরও অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোতে কোনমতে বোঝা যায় যে পথ একটা আছে, এই মাত্র। দূরে দুই একটি আলোর বিন্দু, বুঝলুম যে ঐখানেই বাসের আড্ডা হবে। আর যথার্থ ই তাই—মাঠ ভেঙ্গে স্টেশন কম্পাউণ্ডের বাইরে পৌঁছতেই দেখলুম সার সার, বোধ হয়

পঞ্চাশ ষাটখানা মোটরবাস ও লরী অন্ধকারে ভয়াবহভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারই ত্বদিকে অসংখ্য দোকান কিন্তু তারা তখনও কেউ ঝাঁপ খোলেনি। গুটি তুই চায়ের দোকান খুলেছে মাত্র, দোকানীরা জলের ডেক্‌চি চাপিয়ে উন্থুনের ধারে বসে হাত গরম করছিল, আমাদের দেখে একটু আশান্বিত হয়ে বার-কতক চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিলে 'চা-গরম !'

কিন্তু এধারে চেয়ে দেখি যে কুলীগুলো বেশ নিশ্চিন্ত মনেই মালপত্র রাস্তার ওপর নামাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলুম 'বাস কৈ রে ?'

কুলীপুঙ্গবরা তখন যা নিবেদন করলে তার তর্জ্জমা করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে—বাসওয়ালাদের এখানে একটা এসোসিয়েশন আছে, তাদের হুকুম না পেলে কোন্ বাস আগে যাবে তা ঠিক হবে না। স্থতরাং বাসে মাল চাপিয়ে লাভ নেই, এখনও 'নম্বর' হয়নি ! এসোসিয়েশনের আফিসে উঁকি মেরে দেখলুম, তার দোর খোলা, ভেতরে একটি কেরাণীও বসে আছে, অন্ধকারে ভূতের মত গা ঢেকে। তাঁকে প্রশ্ন করতে শোনা গেল যে ভোরের আলো না উঠলে বাসও ছাড়বে না, নম্বরও দেওয়া হবে না। শেষ রাত্রে অফিসে আলো জ্বালাবার হুকুম নেই বোধ হয় !

যাই হোক, তাঁকে বিনীতভাবে নিবেদন জানালুম, 'সামনের বেঞ্চিটা অধীনদের জন্যে থাকবে ত ?' তিনি জবাব দিলেন,

'সে আমি বলতে পারি না, আগে সিট নিলেই থাক্‌বে।' অর্থাৎ এইখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের মর্জ্জির অপেক্ষা করতে হবে! আগে টাকা জমা দিতে চাইলুম, কিন্তু তিনি নারাজ।

অগত্যা আমরা চারটি প্রাণী অন্ধকারে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রাতকৃত্যের তাগিদ যথেষ্ট, এ অবস্থায় কী করা যায় ভাবছি এমন সময়ে সেই অন্ধকারেই একটি মানুষ এসে পাশে দাঁড়ালো, 'হোটেল, বাবু?'

মনে মনে বিরক্ত হয়েই ছিলুম, বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিলুম, 'আমরা নৈনীতাল যাব!'

সে পরিষ্কার হিন্দুস্থানী ভাষায় জবাব দিলে যে সে কথাটা তারা ভাল-রকমই জানে। তবে যাবার ত এখনও দেড় ঘণ্টা দু-ঘণ্টা দেরী, এই সময়টা আমরা তাদের ঘরে 'আরাম' করতে পারি। চৌপাই আছে, শোওয়া বসার কোন ব্যবস্থারই ত্রুটী নেই। গোসলখানাতে জল-টলের আয়োজনও আছে প্রচুর।

'গোসলখানা' শুনেই লাফিয়ে উঠলুম, প্রশ্ন করলুম, 'কত নেবে বাপু?'

সে জবাব দিলে, 'মাথা পিছু দু-আনা!'

বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললুম, 'চলবে না। এক আনা ক'রে দিতে পারি। দেখ—'

একটু ইতস্তত ক'রেই সে রাজী হয়ে গেল। পূজোর সময় এদেশে ঠাণ্ডা আসে নেমে, যাত্রীও এখন নামার দিকে।

সুতরাং এই সময়টা এদের বড়ই দুরবস্থা। আর সেই জন্যেই, এখান থেকে নৈনীতাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখেছি, হোটেলওয়ালারা অসম্ভব রকম সস্তা রেটে নামতে প্রস্তুত। যাক্—সেই লোকটির পিছু-পিছু বাস-অফিসেরই দোতালায় উঠে গেলুম। হোটেলটির নাম বেশ জ'াকালো, যতদূর মনে পড়ছে 'রয়্যাল'; ঘরগুলোও মন্দ নয়। দড়ীর ভালো খাটিয়া, চেয়ার, আয়না-লাগানো টেবিল, অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই। যদিচ তাতে আমাদের তখন কোন দরকার ছিল না, আমাদের মন তখন গোসলখানার দিকেই একাগ্র।

সবাই মুখ-হাত ধুয়ে যখন নামলুম তখন অন্ধকার ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। উষা আসেন নি, শুধু তাঁর আগমনের আভাস পাওয়া গেছে মাত্র। কিন্তু সেই আব্‌ছায়াতেই ফুটে উঠেছে চারিদিকে মেঘের মত পর্ব্বতশ্রেণীর ছায়া। বেশ একটা চন্‌চনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, রাস্তায় পায়চারী করতে ভালই লাগছিল। রাস্তা-ঘাটগুলিও ভাল, তখন অতটা বুঝতে পারিনি কিন্তু ফেরবার দিন দিনের আলোয় দেখেছিলুম হলদোয়ানি শহরের মতই গুলজার। বিরাট বাজার, সিনেমা, স্কুল সবই আছে। কাঠগুদামে রেলের গুদাম ছাড়া আর কিছু নেই, শহর হ'ল এইটিই। হাওয়াও এখানকার ভাল, কাছেই আলমোড়া নৈনীতাল না থাকলে, চাই কি এইখানেই হাওয়া বদলাতে আসা চলত।

আর একটু পরেই এসোসিয়েশনের সেই বাবুটি ডেকে আমাদের জানালেন যে বাসের নম্বর হয়ে গেছে (মানে কোন্‌খানা যাবে স্থির হয়েছে) এখন আমরা ইচ্ছে করলে স্থান নিতে পারি। বলাই বাহুল্য, আমরা তৎক্ষণাৎ ছুটলুম সামনের সিটের দিকে তীরবেগে, স্থানও দখল করলুম, মালপত্রও উঠল—কিন্তু উঠে যখন বসেছি, হঠাৎ খেয়াল হ'লো সুমথবাবু কৈ ? খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। অনেক খানি হৈ-চৈর পর দেখা গেল ততক্ষণে একমাত্র যে খাবারের দোকান খুলেছে, সেইখানে তিনি ধন্না দিচ্ছেন। ডাকাডাকিতে যখন ফিরে এলেন হাতে দেখি একরাশ 'মিঠা সমোসা' অর্থাৎ মিষ্টি সিঙ্গাড়া—বা লবঙ্গ লতিকা। গম্ভীরভাবে উপদেশ দিলেন 'বোঝনা তোমরা, খালি পেটে কখনও বাসে চড়তে নেই।'

আমাদের মাষ্টার শিবু, এসব ব্যাপারে সে সুমথরও ওপর যায়। সে আবার খান-দুই খাবার পরই সুমথকে খোঁচাতে শুরু করলে, 'ওহে, আর খান কতক সংগ্রহ ক'রে নাও। খাসা জিনিস্‌—কে জানে কখন পৌঁছবো, বেশী ক'রে খেয়ে নেওয়া ভাল।'

ইন্দু সকালের দোহাই দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেল, কিন্তু কে কার কথা শোনে!

যাই হোক্‌—যথাসময়ে বাস দিলে ছেড়ে। ভোরের প্রথম আলো ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত এসে লেগেছে আমাদের মাথায়, ঠাণ্ডা বয়ে আন্‌ছে যেন নগাধিরাজেরই অভ্যর্থনা,

আর তারই মধ্য দিয়ে আমাদের বাসখানি উর্ব্বরা, স্নেহশীলা সমতলভূমিকে পেছনে ফেলে রেখে কলরব করতে করতে ছুট্‌ল আঁকাবাঁকা পথ ধরে নৈনিতালের উদ্দেশ্যে। তখনও পাহাড়ের রুক্ষ, বন্ধুর রূপ চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তখনও তা নীলাভ মেঘের মতই অস্পষ্ট, সুন্দর।

হল্‌দোয়ানি থেকে কাঠগুদাম সামান্য চড়াই থাক্‌লেও পথটা সোজা, কিন্তু কাঠগুদাম ছাড়িয়েই পথ অবিরাম পাক্ খেতে খেতে গেছে। এই পথটিই নাকি ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মোটর পথ, অন্ততঃ বিজ্ঞাপনে তাই বলা হয়। বাস্তবিকই রাস্তাটি ভারি সুন্দর। দার্জ্জিলিং, মুসৌরী-পাহাড়ের রাস্তাও দেখেছি, কিন্তু এর পথটিই সবচেয়ে ভাল লাগ্‌ল। খানিকটা ওঠবার পরই সমতলভূমি গেল চোখের সামনে থেকে মুছে, এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো টুক্‌রোটাক্‌রা পাহাড় একদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আর এক দিকে খাড়া পাষাণ-প্রাচীর, অভ্রভেদী, কঠিন। একটি পার্ব্বত্য নদী বহুদূর পর্য্যন্ত চলল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, এখন বেচারী বড় শীর্ণ, যদিও তার বর্ষাকালের পরিপূর্ণ যৌবনের চিহ্ন দেহসীমা থেকে একেবারে ঘুচে যায়নি, তখনকার রূপটাও কল্পনা করা চলে। আরও একটু ওঠ্‌বার পর সে-ও বিদায় নিলে; ডানদিকের টুক্‌রো পাহাড়গুলোও কখন দেখি ডেলা পাকিয়ে ডাগর হয়ে উঠেছে, তাকে আর অবহেলা করা যায় না কোনমতেই।

রাস্তায় ক্রমশঃ আরও চোখা-চোখা বাঁক দেখা দিল। দার্জ্জিলিং-এ উঠতে উঠতে যেমন সব লুপ দেখা যায়, এখানে দেখলুম তার সংখ্যা বেশী। দেখলুম, আর মনে মনে শঙ্কিত হলুম নামবার দিনের কথা চিন্তা ক'রে, তখন এইসব বাঁকের মুখে দেহের নাড়ীতে এমন ঝাঁকানি দেবে যে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠে আসতে চাইবে। আমাদের স্মমথবাবুরই ভয় বেশী, তিনি ত দেখি ওঠবার পথেই চোখ বুজে মুহ্যমান হয়ে বসে আছেন, বুঝলুম প্রাণপণে বমনেচ্ছা সম্বরণ করছেন।

নৈনিতালের কাছাকাছি এসে বাসটা একবার দাঁড়াল, এইখানে 'টোল্' দিতে হবে। এর আগেই একবার পথে দাঁড় করিয়ে সবাইকে গুণে নেওয়া হয়েছিল, এখানেও একবার মাথা গুণে টোল বুঝে নিয়ে আবার ছেড়ে দেওয়া হ'লো। মাইলপাথর দেখে বুঝলুম যে আর আমাদের বেশী দেরী নেই, নৈনিতাল এসে পড়েছে। বেশ গা ঝাড়া দিয়ে আশান্বিত হয়ে বসলুম, যদিও তখন আর আমাদের গা-ঝাড়া দেবার মত অবস্থা বিশেষ ছিল না, বাসের ঝাঁকানিতে সবাই একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলুম।

যাই হোক—একটু বাদেই বাসটা এক জায়গায় এসে থামল, শুনলুম আমাদের যাত্রা শেষ—এইখানেই নামতে হবে।

যেখানে এই বাসগুলো এসে থামে (ঐখান থেকে আবার ছাড়েও) সেটাকে ওরা বলে তল্লিতাল। এটা হ'ল লেকের

লম্বা দিকের এক প্রান্ত। বাস থেকে নেমে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালুম। ঝল্‌মল্‌ করছে রোদ, কিন্তু তখনও সকালের রোদ, পাহাড়ের গায়ে ধোঁয়া গুলোকে তখনও নীলাভ দেখাচ্ছে। চারদিকে পাঁচীল ঘেরা বাগানের মত ব্যাপার, মধ্যে লেকটি টল্‌টল্‌ করছে—তাকে ঘিরে তিনদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। শহরটা সেই পাহাড়গুলোর ওপরই। দার্জ্জিলিংয়ের চেয়ে ঢের ছোট জায়গা, ঘর-বাড়ীর সংখ্যাও অনেক কম, আর সেই জন্যেই রাস্তাগুলো অধিকাংশই এত খাড়া যে দু'পা হাঁটলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। লেকটিও ছবি দেখে যতটা বড় অনুমান হয়েছিল অতবড় নয় দেখলুম, এমন কি, বোধ হ'ল আমাদের ঢাকুরিয়া লেকের চেয়েও ছোট।

যাক্‌—তবু মোটের ওপর ভালই লাগল। বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস, গায়ের কাপড়টা ভাল ক'রে জড়িয়েও যেন শরীর তাতে না, রৌদ্রে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে।···কুলীরা মালপত্র নামিয়েছে, হোটেলের লোকেরা ছেঁকে ধরেছে, যেখানে হোক একটা বাসা ঠিক করতে হবে। এখন যাত্রীর ভীড় নেই, হোটেলের ঘর অধিকাংশই খালি, সুতরাং প্রতিযোগিতা চলেছে সস্তার পথ ধরে। সবাই বলছে এক টাকায় ভাল ঘর দেবে এবং সবাই বলছে যে অপরের মত মিথ্যা আশা সে দেয় না, সে যা বলে তা কাজেও করে।

বন্ধুদের সেইখানে রেখে আমি হোটেল দেখতে গেলুম। ঠিক বাসস্ট্যাণ্ডের ওপরই হিমালয় বোর্ডিং—সেটা দেখলুম আরও দু-একটা দেখলুম কিন্তু পছন্দ হ'ল না, কেমন যেন ঘরগুলো অন্ধকার মত আর ঠাণ্ডা। শেষে দুর্গাদত্ত শর্ম্মা ব'লে এক গাইড ধরে নিয়ে গেল 'ভিজিটার্স হোম' দেখাতে। সেখানে পৌঁছেই মন বলে উঠল, 'ঠিক এই রকমই চাইছিলুম!' পুব-মুখো নতুন বাড়ী, কাঠের মেঝে আগাগোড়া কার্পেট মোড়া। প্রত্যেকটা ঘরেরই সামনে একটু ক'রে ঘেরা বারান্দা, স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের মত। বারান্দাটিও ভারী চমৎকার, কাঁচের ফ্রেম, কাঁচেরই সারসি জানলা দেওয়া, তাতে ধবধবে সাদা পর্দ্দা মোড়া। ঘরগুলিও পরিষ্কার, ফার্ণিচার ভালো—আর যেটা সবচেয়ে লোভনীয়—চমৎকার বাথরুম।

দুর্গা দত্ত জানালে সিজ্নের সময় নাকি ঐ ঘর গুলোই তারা তিনটাকা ক'রে ভাড়া নেয়, এখন সে একটাকাতেই দিতে রাজী আছে। কিন্তু গোল বাধল খাট নিয়ে, প্রত্যেক ঘরে ওরা দুটো ক'রে খাট দেয় কিন্তু লোক আমরা চার জন। দুর্গা দত্তকে সমস্যার কথাটা জানাতে সে তৎক্ষণাৎ তারও সমাধান ক'রে দিলে, বললে, দৈনিক দুআনা হিসেবে সে আর দুখানা বাড়তি খাট আমাদের ঘরে লাগিয়ে দেবে।

যাক্—বাঁচা গেল। নীচে গিয়ে মালপত্র নিয়ে আবার উঠে এলুম। এখানে এক বাঙ্গালীরও হোটেল আছে, মিসেস্

গাঙ্গুলীর হিন্দুস্থান বোর্ডিং কিন্তু সেটা এত উঁচু যে তাঁর হোটেলের এক ভদ্রলোক ঘর দেখে আসতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাদের সাহসে কুলোল না। পরে জেনেছি যে ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।

ঘরে এসে বিছানাপত্র বিছিয়ে আরাম করে বসা গেল। হোটেলের চাকর, ঠাকুর, বয় যা বলুন ঐ একটি ছেলে ছিল, রতন সিং তার নাম। ভারী সুন্দর চেহারা এবং খুব বাধ্য। এই চাকরটির মত এত পরিশ্রমী এবং নির্লোভ ছেলে খুব কমই দেখেছি। বিশেষতঃ হোটেলে যারা চাকরী করে, তাদের চোখটা সর্ব্বদাই থাকে যাত্রীদের পকেটের দিকে। বখশীষের একটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের আশা না পেলে তাদের কাজের উৎসাহ যায় কমে।

রতন সিং গরম জল এনে দিলে। গরম জলের চার্জ্জ কম নয়, ছু'-আনা বাল্‌তি (অবশ্য দার্জ্জিলিংয়ের তুলনায় কমই)। তবে আমাদের প্রথম দিন ছাড়া গরম জল আর লাগেনি। শীত অতিরিক্ত হ'লেও আমরা ঠাণ্ডা জলেই স্নান করেছি—আর তা সহ্যও হয়েছে। স্নান সেরেই চিঠি লেখার পালা। এখানে আবার সকাল এগারটায় কলকাতার ডাক যায় বেরিয়ে। সুবিধের মধ্যে পোষ্টাফিসটা ঠিক বাস ষ্ট্যাণ্ডটার সামনেই। শেষ মূহূর্ত্তে ফেললেও চলে যায়।

আহারাদি ও বিশ্রামের পর রতন সিংহের জলবৎ চা খেয়ে

যাত্রা করা গেল নগর ভ্রমণের উদ্দেশে। এইবার নগরের কথা কিছু বলা যাক্।

আগেই বলেছি যে ঈষৎ লম্বাটে ধরণের লেক্‌টা, রেলের টাইমটেব্‌লের মতে প্রায় একমাইল লম্বা এবং চারশ'গজ চওড়া। এই লেকটিকে ঘিরে একটি সমতল পথ আছে বরাবর, তার খানিকটা পিচ্ দেওয়া এবং খানিকটা কাঁকর দেওয়া অশ্বারোহীদের জন্যে। দার্জ্জিলিংয়ের মত এখানেও ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়, তবে এদের বিশ্বাস যে পিচ্ দেওয়া রাস্তায় ঘোড়া চালানো যায় না, তারই ফলে এখানে পাহাড়ে ওঠবার একটি পথও পিচ্ দেওয়া নয়—আমাদের মত শ্রীচরণভরসা পদাতিক-দের কী বিপদ যে হতে পারে সেকথা এঁরা চিন্তা করেননি এক-বারও। একে ঐ খাড়াপথ, তাও কাঁকর দেওয়া, প্রতিমুহূর্ত্তেই পদস্খলনের সম্ভাবনা। এই লেকের চার পাশের রাস্তাটি যা ভাল। তা-ও একটা বড় 'ল্যাণ্ডশ্লিপ' হয়ে আমাদের হোটেলের দিকের রাস্তাটা গেছে বন্ধ হয়ে, লেক পরিক্রমার সুবিধে আর নেই। লাটসাহেবের বাড়ী যাবার সোজা রাস্তাই নাকি খসে পড়েছে, তার ফলে সে বেচারীকে অনেক কষ্ট ক'রে আর একটী খাড়া পথে যেতে হয়।

লেকের লম্বাদিকের শেষ প্রান্তে হ'ল তল্লিতাল (বাসষ্ট্যাণ্ডের দিকটা), এদিকেও বাজার-হাট-পোষ্টাফিস আছে, তবে অপর প্রান্তে মল্লিতালই হ'ল আসল শহর। মল্লিতাল যাবার পথে দুই

অশ্বমণ্ডপম্—শ্রীরঙ্গম।

একটা বিলাতী হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং একটা দেশী ও একটা বিলাতী সিনেমা পড়ে। সাহেবদের বসবাসের বাড়ীও অধিকাংশ এই পথে যেতেই পড়ে—মল্লিতালে পৌঁছেই যেটা পাওয়া যায় সেটা হ'ল বিরাট একটা মাঠ, শুনলুম এইখানে ক্রিকেট খেলা হয়, দরবার জাতীয় কিছু করতে হ'লেও এই খানেই করতে হয়। এক লাটসাহেবের বাড়ী ছাড়া এতখানি সমতল ভূমি আর নৈনিতালে কোথাও নেই। আর এই মাঠ পেরিয়েই সাহেবদের 'রিঙ্ক' ও 'ক্যাপিটল' নামে তুটি সিনেমা, থিয়েটার ক্লাব, স্কেটিংরুম প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের আস্তানা। আর তার পরেই হ'ল, একেবারে জলের ধার ঘেঁষে, নৈনিদেবীর মন্দির।

আমরা তখন জানতুম না মন্দিরটা কার, হঠাৎ উগ্র বিলিতী ব্যাপারের পরেই হিন্দুমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে দেখি পাশাপাশি তুটি মন্দির; তার একটি অবিসম্বাদীভাবে শিবের মন্দির, আর একটিতে অনুমানে বুঝলুম, কোন দেবী মূর্ত্তি আছেন। অনুমান, মানে সে পাষাণ মূর্ত্তি দেখে চট্ ক'রে বোঝা কঠিন যে 'পুরুষ কি নারী!' মন্দির তুটি ছোট, কিন্তু স্থানীয় পাহাড়ী নরনারীর ভীড় দেখে বুঝলুম যে তাদের মর্য্যাদা ছোট নয়। মনে, বড় কৌতূহল হ'ল, কয়েকটি সাহেবী পোষাকপরা পাহাড়ী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে মন্দিরের সামনে ঝোলানো ঘণ্টাগুলি বাজাচ্ছিলেন, তাদেরই একজনকে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, 'এ মন্দিরটি কার?'

তিনি ইংরাজীতে জবাব দিলেন, 'বল্ছি। একমিনিট অপেক্ষা করুন।'

তারপর উভয় মন্দিরের সামনেই বহুক্ষণ ধরে প্রণাম ক'রে তিনি আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে জলের ধারে এক বেঞ্চিতে বসিয়ে যে ইতিহাস বিবৃত করলেন তা সংক্ষেপে এই—

অনেকদিন আগে এই কুমায়ুন রাজ্যের (অধুনা জেলা) নয়নী দেবী বা নন্দা দেবী বলে এক পুণ্যশীলা রাণী ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশে জন্মেছেন এই ছিল সবাইকার বিশ্বাস। পাহাড়ীরা তাঁকে এতই ভক্তি করত যে, বলতো—এখান থেকে আশে পাশে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রায় ষোল হাজার মন্দির আছে, সবগুলিই তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত। নন্দীদেবী পর্ব্বত নামে হিমালয়ের যে শৃঙ্গ, তাও নাকি তাঁরই নামে। নৈনিতালের এই মন্দিরটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত, বহুকালের প্রাচীন মন্দির। এখন যেখানে মন্দিরটি আছে আগে এর থেকে বহু পেছনে ছিল, তখন লেকও ছিল ততদূর অবধি বিস্তৃত। পরে দেবী স্বপ্ন দেন যে শীঘ্রই বিরাট একটা পাহাড় ধ্বস্‌বে, তাতে তাঁর মন্দিরও ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু তাতে ভয় পাবার দরকার নেই; তাঁর পুরোনো মন্দিরের চূড়ো যেখানে গিয়ে পড়বে সেইখানেই আবার নতুন মন্দির গড়ে তুলতে হবে। সেই আদেশ মতই নাকি বর্ত্তমান মন্দির গঠিত হয়েছে, আর ঐ যে এতখানি

লক্ষভলভূমি সেও সেই পাহাড় ধ্বসারই ফলে পাওয়া গেছে, মানে লেক গেছে অতটা বুজে।

আমরা যথাসাধ্য ভক্তিভরে এই কাহিনী শুনলুম। তারপর নন্দাদেবীকে প্রণাম করে উঠলুম মল্লিতালে।

মন্দির পেছনে ফেলে সোজা যে পথ মল্লিতাল বাজার ও ডাক-ঘরের দিকে উঠেছে সে পথে প্রথমেই পড়ে খানিকটা মুসলমান পাড়া। তার পরই বাজার—কতটা মল্লিতালের মতই, তবে দু-একটা অপেক্ষাকৃত বড় দোকান আছে ; এ-পারে এই হিসেবে এটাকেই বড়-বাজার বলা চলে। তাছাড়া একটা মিউনিসিপাল বাজারও আছে এখানে, তার মধ্যে ফলের দোকানই সব। বাজারের ওপরই ডাকঘর। তারও ওপরে শহর আছে, অধিকাংশই বিলিতী পাড়া, অফিস অঞ্চলও বলা চলতে পারে। এই মল্লিতালেরই পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা উঠে গেছে 'চিনাপিকে' অর্থাৎ নৈনিতালের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে। এই চীনাপিকই হ'ল নৈনিতালের সব চেয়ে বড় দ্রষ্টব্য! কারণ এখান থেকে প্রায় পাঁচশ মাইল পর্য্যন্ত হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী দেখা যায়, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সে কথা পরে বলছি।

এমনি নৈনিতাল শহরের কোথাও থেকে 'তুষার' দেখা যায় না, কারণ আগেই বলেছি যে এ যেন পাঁচীল ঘেরা শহর, পাঁচীলের ওপরে না উঠলে ওপারের কিছু নজরে পড়ে না।

তবে শুনলুম যে ডিসেম্বর মাস নাগাদ এই পাহাড় ও গাছ-পালাগুলি বরফে ঢাকা পড়ে সাদা হয়ে যায়, তখনকার অবস্থাটা কল্পনা ক'রেই শিউরে উঠলুম, এখনই এত ঠাণ্ডা, তখন না জানি কী অবস্থাই হয়!

বেড়িয়ে যখন বাসায় ফিরে এলুম তখনও বোধহয় আটটা বাজেনি—কিন্তু তখনই পথঘাট নির্জ্জন হয়ে এসেছে, শহর যেন তন্দ্রাতুর। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে হু-হু করে, সে ঠাণ্ডায় বাইরে কেউ থাকতে চায় না, দোকান-বাজারে যায় কে? সুতরাং দোকানীরাও তাড়াতাড়ি ঝাঁপ বন্ধ ক'রে বাড়ী ফেরবার যোগাড় করছে। আমরাও আমাদের ঘরটিতে ফিরে এসে যেন বাঁচলুম, হাড়ের মধ্যে পর্য্যন্ত কন্‌কনানি ধরে গিয়েছিল।

সেদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমা, কোজাগরী। সবচেয়ে মধুর জ্যোৎস্না পাওয়া যায় বছরের এই দিনটিতেই। এখানে পাহাড়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে চাঁদ উঠ্‌তে কিছু বিলম্ব হয়, সুতরাং নীচে থাকতে মনেই পড়েনি যে আজ পূর্ণিমা, হোটেলের কাচের বারান্দাটিতে উঠে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ঠিক আমাদের সামনেই দেখা দিয়েছেন পূর্ণচন্দ্র, আর তারই আলোতে সমস্ত পাহাড়-গুলোর ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে লেকের জলে। আমরা বারান্দার বিজলী আলো নিভিয়ে স্তব্ধ হয়ে সেই দিকে চেয়ে বসে রইলুম—অনেকক্ষণ ধরে। শান্ত, রহস্যময়, ঈষৎ ভয়াবহ সেই পাহাড়গুলির নিবিড় ছায়া, আর তার কাছে একফালি

নীল আকাশ এবং শুভ্র চন্দ্রের শোভা, সবগুলো মিলিয়ে কী অপূর্ব্ব ছবিই রচনা করেছিল! সে সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়।

পরের দিন সকালে আমাদের হোটেলের ঠিক সামনেই যে উঁচু চূড়োটা দেখা যায় সেইটের ওপরে উঠেছিলুম। এমন কিছু উঁচু নয় অবশ্য, কিন্তু পথগুলো খুব খাড়া বলে তাইতেই কষ্ট হ'ল। আর পাহাড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা রইল না। অগত্যা আমরা নৌকা বিহার করেই সেদিনের মত বেড়ানর সাধ মিটিয়ে নিলুম। এখানকার এই নৌকাগুলি বেশ। খুব হাল্‌কা পান্‌সি, বেশ দু'খানি চেয়ারের মত করা আছে, তাতে চমৎকার কুশান দেওয়া। সামনে আরও বসবার জায়গা আছে বটে তবে সেগুলিতে অত আরামের ব্যবস্থা নেই। প্রথমদিন এসেই দর জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বলেছিল মাথা পিছু ছ' আনা। আজ আমরা ইন্দুকে এগিয়ে দিয়েছিলুম আগে, সে দরদস্তুর ক'রে গোটা নৌকোটা সাত আনায় ঠিক করে ফেললে। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা আরাম ক'রে নৌকায় চেপে বসলুম। পরিষ্কার কালো জল, তারই মধ্যে দিয়ে ছপ্‌ ছপ্‌ ক'রে দাঁড় ফেলে নৌকাগুলো বেয়ে চলে যায়, চারদিকে সুন্দর ছবির মত শহরটি দেখা যায়—খুবই ভালো লাগে ব্যাপারটা। একটা কথা এইখানে বলে রাখি, এর পর থেকে আমরা রোজই নৌকো

চড়েছি এখানে, কিন্তু দরটা ক্রমশ কমিয়ে চার আনা এমন কি তিন আনাতে দাঁড় করিয়েছিলুম। তিন আনাতে পাঁচজন পর্য্যন্ত চড়েছি।

তার পরদিন স্থির হ'ল লাট সাহেবের বাড়ী যেতে হবে। সকালে নয় বিকেলে। সে ইচ্ছা আমাদের আরও প্রবল ক'রে তুললে মাষ্টার শিবু; আমরা যখন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটুখানি 'গা গড়িয়ে' নিতুম সে তখন শুত না, খিদে করবার জন্য তখনই আপেল চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে পড়ত, বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে! (আপেল বস্তুটি এখানে ভারী সস্তা, চার আনা থেকে ছ' আনা সের, যেমন সরস, তেমনি সুস্বাদু। ঈষৎ টক্-রস-যুক্ত, ঠিক আমাদের দেশের বাক্সমোড়া আপেলের মত পান্‌সে নয়, কিন্তু ভারী চমৎকার। আর পাকা 'পিয়ার' যাকে কাবুলি নাস্‌পাতি বলা যেতে পারে, তাও খুব সস্তা, চার আনা সের) যদিচ, এম্‌নিই তার যা খিদে বেড়ে গিয়েছিল, বলতে নেই, তাতে আমরা ঈষৎ ভীতই হয়ে পড়েছিলুম। মানে, অত দ্রুত চেঞ্জটা ঠিক স্বাস্থ্যকর কিনা, এই আশঙ্কায়! যাই হোক্—ও সেদিন ঘুরে এসে বললে যে, ও নাকি লাট-সাহেবের বাড়ীর রাস্তা-ঘাট দেখে এসেছে, প্রায় কাছাকাছি গিয়েছিল, ভারী চমৎকার রাস্তা, ইত্যাদি—।

সুতরাং স্থির হ'ল যে আজই যাওয়া হবে। কিন্তু চা প্রভৃতি উদরসাৎ করতে করতেই চারটে পার হয়ে গেল। যদিও তাতে

আমরা দমলুম না, মহোৎসাহে পাহাড়ে চড়তে শুরু করলুম। এ পথটি তল্লিতাল বাজারের মধ্যে দিয়েই উঠে গিয়েছে, বাজারকে পিছনে রেখে। খাড়া পথ, আস্তে-আস্তে এখানের কোন পথই ওঠেনা, সবই প্রায় এমনি, তবে এ পথটা যেন আরও অভদ্ররকমের খাড়া। অনেক কষ্টে, হাঁপাতে হাঁপাতে, বিশ্রাম করতে করতে উঠতে লাগলুম। বড় একটা কলেজ, মেয়েদের আধা-আশ্রম আধা-কলেজ এবং গির্জ্জে পথে পড়ল। এসমস্ত অতিক্রম ক'রে যখন শেষ পর্য্যন্ত লাট প্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছলুম, তখন আবিষ্কার করলুম, ও হরি—সেদিন "প্রবেশ নিষেধ!"

কিন্তু কী আর করা যায় বাইরে থেকেই যতটা সম্ভব দেখে আবার প্রত্যাগমনের পথ ধরা গেল। তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে, বড় বড় গাছের ছায়ায় বিশেষ কিছু দেখা যায় না, তবে এইটুকু বেশ বুঝলুম যে এই স্থানটিই সমস্ত শহরের মধ্যে একমাত্র সমতল জায়গা এবং এর মধ্যে বড় বাগান, মাঠ, গল্‌ফ্‌ কোর্স সব আছে। এইরকম খাড়া পাহাড়ের চূড়োয় এতখানি স্থান সমতল করতে, বাগান করতে এবং এতবড় প্রাসাদ গড়ে তুলতে আর তার মধ্যে সমস্ত রকম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে কত অকারণ অর্থব্যয়ই না হয়েছে, কত লক্ষ মুদ্রা,—এই কথা চিন্তা করতে করতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমরা আবার মন্থর গতিতে চলতে শুরু করলুম। এবার আর পুরোনো পথে নয়,

মল্লিতাল থেকে যে রাস্তায় লাটসাহেব আগে আসতেন সেই পথ ধরে মল্লিতালে নামতে লাগলুম। এই পথটিই অপেক্ষাকৃত সহজ, এটা ভেঙ্গে যাওয়ায় মোটর আসা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু পদচারীদের যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। মল্লিতাল থেকে যে পথে আমরা উঠেছিলুম, ওটা এতই খাড়া যে মোটর ওঠা অসম্ভব। কেবল শুনলুম, যে এক পাঞ্জাবী ড্রাইভার ওপথেও একদিন গাড়ী তুলে লাট সাহেবের কাছ থেকে একশ' টাকা বখশীষ পেয়েছিল।

অতখানি শফর ক'রে আমাদের পায়ের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছিল কিন্তু আশ্চর্য্য মল্লিতাল বাজার পেরিয়ে লেকের ধারে সমতল রাস্তায় পৌঁছতেই অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠলুম। এই সব ঠাণ্ডা পাহাড়ে হাওয়ার এই একটা আশ্চর্য্য গুণ, পথ ভাঙ্গতে যত কষ্টই হোক না কেন, একটু বিশ্রাম ক'রে নিলেই আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠা যায়। যাই হোক্—লেকের ধারের 'মজ্নু' গাছের ছায়াবীথি দিয়ে আসছি (এই গাছগুলি ভারী চমৎকার—এর শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগগুলি সব নিম্নমুখী, লেকের ধারে এই গাছগুলিই বেশী, জলের ওপর থেকে ভারী চমৎকার দেখায় একে যেন কোনও সুন্দরীর সোনালী চুল জল স্পর্শ ক'রে আছে। কে যেন বলেছিল যে একেই **weeping willow** বলে) এমন সময় তিনটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা! প্রথমটা বাঙ্গালী দেখেই আনন্দ হচ্ছিল, পরে আবার

দেখা গেল তাঁরা পরিচিত। ইন্দুরই জ্ঞাতিভাই একজন, কাশীপুরের ডাক্তার সুশীল দাশগুপ্ত ; তাঁর বন্ধু কারমাইকেলের ডাক্তার হেমন্তবাবু, আর একজন সর্ব্বশেষ !কিন্তু সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ডাঃ প্রভাত সিংহ—এঁরা সেই দিনই এসেছেন, সুশীলবাবু সপরিবারে—এবং এসে উঠেছেন হিন্দুস্থান বোর্ডিং-এ। এত উঁচু ও খাড়া তার পথ যে বৌদি একবার কোনমতে উঠে আর 'পাদমেকং' না যাবার সঙ্কল্প করেছেন, এঁদেরও প্রাণান্ত। তাছাড়া মাথাপিছু চারটাকা ক'রে দিয়েও এঁরা আহারাদির দিক দিয়ে নাকি সন্তোষ পাচ্ছেন না। ব্যস্ —তখনই কথা হ'ল যে পরের দিন সকাল বেলাই ইন্দু গিয়ে ওঁদের মালপত্র সুদ্ধ আমাদের হোটেলে নিয়ে আসবে।

তাই হ'ল। এতে আমাদের সুবিধে হ'ল খুব,—প্রথমত এতগুলি বাঙ্গালী এবং পরিচিত প্রতিবেশী, দ্বিতীয়ত প্রভাতদার মত রসিক লোকের সঙ্গে বাস—আর তৃতীয়ত এঁদের আওতায় ও বৌদির কল্যাণে আহারের উত্তম ব্যবস্থা। সুশীলবাবু এত-রকম আহার্য্যের ব্যবস্থা করলেন, ভোজনবিলাসীদের পক্ষে একান্ত উপভোগ্য হলেও নগাধিরাজের রাজ্যে সেগুলি দুর্লভ বলেই ধারণা ছিল। বৌদির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আরও বেরিয়ে পড়ল, তিনি আমাদের বন্ধু, সাহিত্যিক-শিল্পী অখিল নিয়োগীর ভগ্নী। অর্থাৎ সুবিধে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা।

সেদিনটা এমনি বেড়িয়ে কাট্‌ল। পরের দিন আমরা গেটিয়ার দিকে অভিযান করলুম। যাবার পথটি ভাল, কেবলই নিম্নগামী, রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্য দিয়ে বেশ লাগছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুক শুকিয়ে গেল এই ভেবে যে এতখানি পথ ভেঙ্গে আবার খাড়া উঠ্‌ব কি ক'রে! সঙ্গীরা আশ্বাস দিলেন, খেয়ে দেয়ে সেই ওবেলা, নয়ত কাল সকালে আস্তে আস্তে ওঠা যাবে'খন। চাইকি যাদের বাড়ী যাচ্ছি তারা একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন। একবার চলোনা, দেখবে আর কিচ্ছু ভাবতে হবেনা।

অবিশ্যি ভাবতেও হ'লো না কিছু, কারণ সেখানে পৌঁছে শোনা গেল যে তাঁরা মীরাটে কোন্ আত্মীয়ের বাড়ী পূজো দেখতে গেছেন, এখনও ফেরেননি, বাংলায় তালা দেওয়া!

তৎক্ষণাৎ আবার সেই খাড়া দীর্ঘ পথ! সম্বলের মধ্যে গোটাকতক আপেল নেওয়া হয়েছিল। খানিকটা ক'রে যাই আর বসি, মধ্যে মধ্যে আপেলের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজি—এই ভাবে যখন বেলা একটা নাগাদ ফিরে এলুম তখন আর গায়ের ব্যাথায় কেউ নড়তে পারছি না।

এর পরের দিন পড়ল রবিবার, সেদিন লাটপ্রাসাদ দেখতে যাবার দিন। বিকেলে সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গেল। কিন্তু তার পূর্ব্বে সুশীলবাবু একটি দুষ্কার্য্য ক'রে গেলেন। এখানে এসে পর্য্যন্ত ডিম আর মাংস খেয়ে তাঁর বাঙ্গালীর রক্ত বিদ্রোহ

করেছিল। তিনি অনেক দুঃখে, অনেক খুঁজে বাজার থেকে পাঁচসিকা সের দিয়ে কিছু রুই মাছ (তার মৃত্যুর তারিখ যে অন্ততঃ দশবারো দিন পূর্ব্বে চলে গেছে তা সহজেই অনুমেয়) ও কিছু লেকের টাট্‌কা ট্রাউট মাছ সংগ্রহ ক'রে চাকরকে দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন ও সেই সঙ্গে আমাদের শাসিয়ে রাখলেন, 'আপনারা একটু দেরী ক'রে খাবেন, মাছ তৈরী হ'লে তবে।'...কে জানত যে ঐ মাছ তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করবে।

যাই হোক্ মল্লিতালের পথ বেয়ে আমরা ত সন্ধ্যা হচ্চে-হচ্চে সময়ে লাট প্রাসাদে পৌঁছলুম। বেশ মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছি, পাহাড়ের ওপর বিস্তৃত গল্‌ফ্ কোর্ট দেখে মনে মনে ঈর্ষিত হচ্ছি, দূর থেকে কোন্ ঘরটায় দরবার হয় সেই সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছি, এমন সময় এক অঘটন ঘটল। প্রাসাদের মধ্যে একটা অংশ ছিল নিষিদ্ধ। অত খেয়াল নেই আমাদের, আমরা গল্প করতে করতে সেইদিকে গিয়ে পড়েছি, আর তখন বেশ অন্ধকারও হয়েছে, অকস্মাৎ অত্যন্ত পরুষ এবং বিজাতীয় কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল—'হুজ্ দ্যাট্!'...আমরা ত আর নেই। শিবুর অবস্থা আরও কাহিল, সে একেবারে এক লাফে প্রভাতদার পেছনে, আমাদের যে কী, তা আর বর্ণনা না করাই ভাল। সুবিধের মধ্যে প্রভাতদা বহুদিন ভারতবর্ষের বাইরে চাকরী করেছেন, এসব মিলিটারী ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তিনিও মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই হাত বিস্তারিত ক'রে জবাব দিলেন, 'ফ্রেণ্ডস্'।

দেবতা প্রসন্ন হলেন, আদেশ হ'ল, 'পাস্' অর্থাৎ যেতে পারো।

তখন অন্ধকারই হয়ে এসেছিল, আমরা আর জীবন বিপন্ন না ক'রে ফটকের পথই ধরলুম।

পরের দিন সকালে 'চীনাপিক্'-এ যাবার কথা। কিন্তু ভোরবেলা উঠে শোনা গেল যে সুশীলবাবুর পেটে কলিক্ ধরেছে, ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন, প্রভাতদা এবং হেমন্তবাবু দুজনেই ছুটোছুটি করছেন। ভীষণ কাণ্ড! অতএব সেদিনটা স্থগিত রইল, পরের দিনও সুশীলবাবু ও হেমন্তবাবু রয়ে গেলেন, আমরা চারজন আর প্রভাতদা মাত্র যাত্রা করলুম। যাত্রার পূর্ব্বে ইন্দুর তৈরী চা আর হালুয়া খেয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই ভরসায় অতগুলি প্রাণী কোন রকম জল বা খাবারের ব্যবস্থা না করেই পাহাড়ে উঠতে শুরু করলুম, কারণ শুনেছিলুম পথ মাত্র মাইল তিনেক, কতক্ষণই বা লাগবে!

ও মশাই! তখন কে জানত যে সে ডালভাঙ্গা মাইল!

কাশী থেকে আসবার সময় মিঃ ব্যাস নামক এক বৃদ্ধ জহুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর ওখানে বাড়ী আছে, বলে দিয়েছিলেন যে চীনাপিকে ওঠবার ঠিক আধা পথে তাঁর বাড়ী, দৃশ্য যা কিছু তার থেকেই দেখা যায়, অনেকেই আর উঠতে পারে না, সেইখান থেকেই দেখে। আর বেশী ওঠবার দরকার নেই, দৃশ্য নাকি একই রকম দেখায়, সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ

নৈনিতালের হ্রদ—ওপারে মল্লিতাল

পুষ্কর হ্রদ

থেকেও যা, তাঁর বাড়ী থেকেও তাই। তিনি দিন-দুই সেখানে থেকে আলমোড়া যাবেন, আমাদের নিমন্ত্রণও জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা দু'দিনের মধ্যে যাইনি।

যাই হোক্—খানিকটা ওঠবার পরই আমরা 'ব্যাস ভিলা' খুঁজছি, কিন্তু কোথায় ব্যাসভিলা? একেবারে খাড়া পথ, উঠছে ত উঠছেই—মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তবু ব্যাসভিলার দেখা নাই। আটটার সময়ে পাহাড় উঠতে আরম্ভ করেছি, ঠিক দশটার সময় দেখলুম মাঝামাঝি একটি সঙ্কীর্ণ শৃঙ্গের ওপর ব্যাস সাহেবের বাড়ী—ব্যাস ভিলা! বাড়ী বন্ধ, তালা দেওয়া—হয়ত কোন দারওয়ান আছে কিন্তু তারও পাত্তা নেই! তবে ভাগ্যিস্ ফটকটা খোলা ছিল, বাগানে অবাধ প্রবেশাধিকার। কারণ ভিলার বাইরে গাছের ফাঁক থেকে তুষার রাশির যা সামান্য আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তাই আমাদের চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু বাগানে ঢুকে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সে কী দৃশ্য, ইংরিজীতে যাকে বলে 'গ্লোরিয়াস্'। সাদা তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী, পরিষ্কার নীল আকাশের কোলে প্রখর সূর্য্য-কিরণে চক্ চক্ করছে। দার্জ্জিলিং থেকেও দেখা যায় বটে মধ্যে মধ্যে, কিন্তু সে যেন বড় দূর, এখানে মনে হ'ল হাতের কাছে একেবারে। হয়ত দূরত্ব সমানই, তবে আমাদের মনে হ'ল এগুলো খুব কাছে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। তাছাড়া আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলে দার্জ্জিলিং থেকে

কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এভারেষ্ট ছাড়া আর বিশেষ কোন শৃঙ্গ দেখা যায় না—কিন্তু এ একেবারে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ—বহু দূর বিস্তৃত গিরিশ্রেণী। পরে শুনেছিলুম যে চীনাপিক্ থেকে যতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় তার দৈর্ঘ্য পাঁচশ' মাইলেরও বেশী।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাস ভিলা থেকে আমরা নানা ভাবে এ দৃশ্য দেখলুম। ব্যাস ভিলার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এর বাগানে দাঁড়িয়ে ওধারে যেমন তুষার দেখা যায় এধারে তেমনি সমস্ত নৈনিতাল শহরটিও চোখের সামনেই জ্বল্-জ্বল্ করে। নীল সরোবরটি শহরের মধ্যস্থলে যেন মনে হয় সবুজ ফ্রেমে আঁটা আয়না, তাতে প্রতিফলিত হয়ে সূর্য্যদেবও স্নেহে ছল্‌ছল্ করতে থাকেন।

আমরা বহুক্ষণ ব্যাসভিলায় রইলুম তারপর আবার উত্থান। আমি ব্যাস সাহেবের কথা বুঝিয়ে বল্লুম কিন্তু বলা বাহুল্য যে ওঁরা কেউই তা বিশ্বাস করলেন না। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমারও মনে হচ্ছিল যে এখনই এই দৃশ্যটি পিক্-এর ওপর থেকে না জানি আরো কী চমৎকারই দেখায়! কিন্তু উঠতে আর পারি না, আমাদের মধ্যে ইন্দু ছিল যাকে বলে পালক-ভার, সুতরাং ও বেশ অবলীলাক্রমে এগিয়ে যেতে লাগল, এমন কি একটার পর একটা, ওর যতগুলো গান জানা ছিল সবই শেষ করতে লাগল কিন্তু যত বিপদ আমাদেরই। সমস্ত দেহ বিদ্রোহ করতে থাকে, শ্যামা মেদিনীর আকর্ষণ ক্রমেই প্রবলতর হয়ে ওঠে।

যাই হোক্—আরও বহুক্ষণ ওঠবার পর আর একটি স্থান পাওয়া গেল—যেখান থেকে বেশ ভাল দৃশ্য পাওয়া যায়। এইখানে কতকগুলি কুমায়ুন জেলার লোকের দেখা পাওয়া গেল, তারা বললে এইখান থেকেই সবচেয়ে বেশী তুষারমণ্ডিত গিরি-শৃঙ্গ নজরে পড়ে, আর না উঠলেও চলে। তারা কতকগুলো পাহাড়ের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিলে ; ঠিক সামনেই নাকি নন্দাদেবী পর্ব্বত, আরও অনেক নাম করলে, তা আর আজ মনে নেই।

এখানে খানিকটা জিরিয়ে আবার উঠতে লাগলুম। এবার অবস্থা খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল, পিপাসায় বুক অবধি শুক্‌নো পেটে আগুন জ্বল্‌ছে, পা বিষম ভারী। বল্লুম, চলুন ফিরে যাই—কিন্তু প্রভাতদা নাছোড়বান্দা, তিনি উঠবেন ত বটেই আমাদেরও তুলবেন শেষ পর্য্যন্ত। অবিশ্যি প্রভাতদার জন্য ওঠা সম্ভব হয়েছিল শেষ অবধি, কারণ এমন রসিক লোকের সঙ্গে সুমেরু অভিযানও করা যায়, চীনাপিক ত তুচ্ছ। যখনই দেহ অবশ হয়ে আসছে, ঠাণ্ডা কন্‌কনে শুকনো হাওয়ায় হাড় পর্য্যন্ত হিম হবার জো, প্রভাতদার অপূর্ব্ব রসিকতা আবার আমাদের চাঙ্গা করে তুলছে। প্রভাতদা ভারতবর্ষের বাইরে বহু স্থান ঘুরেছেন, তারই বিচিত্র ও সরস অভিজ্ঞতা শুন্‌তে শুন্‌তে কোন-মতে চলতে লাগলুম।

কিন্তু শেষের এই পথটুকু আরও খাড়া, একসঙ্গে পঞ্চাশ গজের বেশী ওঠা যায় না বিশ্রাম না নিয়ে। তার ওপর সঙ্গে

কোন পানীয় পর্য্যন্ত নেই। ফেরবার পথে এক সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি দেখলুম রীতিমত এক ফ্লাস্ক জল নিয়ে উঠ্‌ছিলেন—বুঝলুম 'ইহাই নিয়ম'—আমরাই বেকুবী করেছি। আর সবচেয়ে ট্রাজেডী কি জানো? ব্যাসভিলা ছাড়াবার পরই বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ জমতে আরম্ভ হ'ল ওধারে হিমালয়ের গায়ে, ফলে অনেকগুলি শৃঙ্গই ক্রমে ঢাকা পড়ে গেল। এত দুঃখের পর যখন উঠলম ওপরে, তখন দেখলাম যে আর দেখার মত বিশেষ কিছুই নেই চোখের সামনে। ঐ জন্যেই হোটেলওলা ভোরে আসতে বলেছিল, বুঝতে পারা গেল!

আর সবচেয়ে অভদ্র এখানের মিউনিসিপ্যালিটী—এইটেই যখন এখানকার বল্‌তে গেলে একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থান এবং সবাই আসে, তখন এখানে কি একটা কিছু বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে রাখা উচিত ছিল না? সে ব্যবস্থা ত নেই-ই, এটা কত উঁচু কিংবা এখান থেকে কোথাকার কোন্ কোন্ শৃঙ্গ দেখা যায় তার কোন নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত দেওয়া নেই। যে যা পারো বুঝে নাও। এর সঙ্গে দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটীর তুলনা করলে বোঝা যায় যে, দুটোর মধ্যে ব্যবস্থার তফাত কত।

ওপরে আমরা অনেকক্ষণ বসে বিশ্রাম করলাম। এদিকে সাবধানে একটু এগিয়ে এসে নৈনিতাল দেখা যায়, ওদিকে আলমোড়া এমন কি রাণীখেত পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় এর ওপর।

তবে মোট কথা এই বুঝলাম যে—এত কষ্ট করে এত ওপরে না উঠলেও চল্‌ত, এর আগে যেখান থেকে আমরা দেখেছি সেইখান দিয়ে গেলে কিছুমাত্র ঠকতুম না। একেই বলে আশার ছলনা!

এবার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। ক্লান্ত দেহ, পা আড়ষ্ট, তৃষাতুর কণ্ঠ—তবে কিনা মাধ্যাকর্ষণ প্রবল তাই উঠতে যেখানে চার ঘণ্টা লেগেছিল সেই পথ আমরা অনায়াসে এক ঘণ্টায় নেমে এলাম। তবুও বাসায় যখন ফিরে এলাম তখন বেলা দুটো। স্নান করারও ধৈর্য্য নেই তখন, কোনমতে রতন সিংহের প্রস্তুত ডালভাত চারটি খেয়ে একেবারে শয্যা গ্রহণ।

সেইদিন থেকেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজল, সেইদিনই গেলেন হেমন্তবাবু, পরের দিন শিবু আর প্রভাতদা, তাঁর পরের দিন আমরা সবাই। সেই মোটঘাট বাঁধা, দেশের জন্য আপেল কেনা এবং বাস-যাত্রা। স্থানটি আমাদের এমন কিছু আকর্ষণ করতে পারেনি, দার্জ্জিলিংয়ের মত প্রতি-নিয়ত স্নেহবন্ধনে জড়িয়ে ধরেনি, কিন্তু তবুও আজ বিদায়ের ক্ষণে একটু মন খারাপ হয়ে গেল বৈকি! তিনদিকের সেই রুক্ষ বন্ধুর পাষাণ প্রাচীর, আর তার মধ্যের ছলো-ছলো সরোবর,—সবই যেন আজ মনের উপরে ভালোবাসার দাগ টেনে দিল। ক্রমে বাসে চড়ে যখন অবিরত নামতে লাগলুম, বড়

বড় পাহাড়গুলিও ক্রমে দূর হতে দূরে সরে যেতে লাগল;
চোখের সামনে একটু একটু ক'রে সমতল জমি জেগে উঠে সঙ্গে
সঙ্গে মনে জাগিয়ে দিল আবার সেই জীবন সংগ্রামের কথা,
আবার সেই দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও সহস্র অভাব! মনে হ'ল যে
বেশ ছিলুম নগাধিরাজের শ্রীচরণতলে, তাঁর শীতল আশ্রয়ে এই
পৃথিবীর সকল দুঃখ ভুলিয়ে রেখেছিলেন তিনি। শুধু শরীরটাই
আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ঊর্দ্ধে ওঠেনি, বোধহয় মনটাও
উঠেছিল।...

শীতল কোমল শান্তিদায়িনী সে আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে
আবার এসে পড়লুম আমরা উষ্ণ, পঙ্কিল, কোলাহলপূর্ণ ধূলির
ধরণীতে—

এক সময়ে চম্‌কে চেয়ে দেখলুম, হল্‌দোয়ানী!

শেষ

আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

হেমেন্দ্রকুমার রায়

- আজব দেশে অমলা (Alice in Wonderland) — ॥০
- মানুষ পিশাচ (উপন্যাস) — ৸০
- মড়ার মৃত্যু ঐ — ॥০
- ছায়া-কায়ার মায়াপুরে — ।৶০

সুনির্ম্মল বসু

- লালন ফকিরের ভিটে — ।৶০
- গুজবের জন্ম — ।৶০
- আদিম দ্বীপে (উপন্যাস) — ।৶০

বুদ্ধদেব বসু

- গল্পঠাকুরদা — ।৶০
- একপেয়ালা চা — ।৶০
- পথের রাত্রি — ॥০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

- ব্যোমদাসের মাদুলি — ।৶০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

- মণ্টুর মাষ্টার — ।৶০
- মানুষের উপকার কর — ।৶০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

- জীবনের সাফল্য — ।৶০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

- সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি — ।৶০

বাগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

- সোনার পাহাড় (উপন্যাস) — ॥৶০
- মায়ের গৌরব ঐ — ॥৶০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

- দুর্গম পথে — ॥৶০

বন্দে আলী মিয়া

- তিন আজগুবি — ।৶০

রবীন্দ্রলাল রায়—

- বীরবাহুর বনিয়াদী চাল — ।৶০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও ধ্রুবেশ চন্দ্র অধিকারী

- এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার — ।৶০

সুবিনয় রায় চৌধুরী

- বল তো (ধাঁধার বই) — ॥৶০

প্রভাত কিরণ বসু

- রাজার ছেলে (উপন্যাস) — ॥৶০

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

- পাতালপুরের আংটি (উপন্যাস) — ॥৶০

সুধাংশু দাশগুপ্ত

- মায়াপুরীর ভূত — ।৶০
- বুদ্ধির লড়াই — ।৶০
- পরীর গল্প — ।৶০

গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

- কালগ্রাসে কালযবন — ॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

- কল্পলোকের কথা — ॥০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

- কায়াহীনের প্রতিশোধ — ॥০

সুকুমার দে সরকার

- অরণ্য রহস্য (উপন্যাস) — ।৶০

শৈল চক্রবর্ত্তী

- বেজায় হাসি (কবিতার বই) — ।/০

দীনেশ মুখোপাধ্যায়

- অচিন দেশের রাজকন্যা (রূপকথা) — ।৶০

ধর্ম্মদাস মিত্র

- খাদে ডাকাতি — ।৶০

প্রবোধকুমার সান্যাল

- সত্যি বলছি — ॥০

যুদ্ধের দরুণ উপরি-উক্ত প্রতি পুস্তকের দাম দুই আনা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই লেখকের লেখা—

মনে ছিল আশা

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্

রজনীগন্ধা

পুরুষ ও রমণী

দুর্ঘটনা

—ছোটদের—

পৃথিবীর ইতিহাস

বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন (১ম খণ্ড)

বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন (২য় খণ্ড)

আমাদের পৃথিবী

এ টেল অফ টু সিটিজ্

ছেলেদের আরব্য উপন্যাস

শিশু রামায়ণ

শিশুদের মহাভারত

কল্পলোকের কথা

সাহসের নেশা

ভিক্তর হুগোর গল্প

কাউণ্ট অফ মণ্টেক্রীষ্টো

ডিকেন্সের গল্প

ইউরোপের সেরা সাহিত্যিক

তরুণ গুপ্তের বিচিত্র কীর্ত্তিকথা

প্রভৃতি—